# অবকাশ

সন্তোষ ঢালী

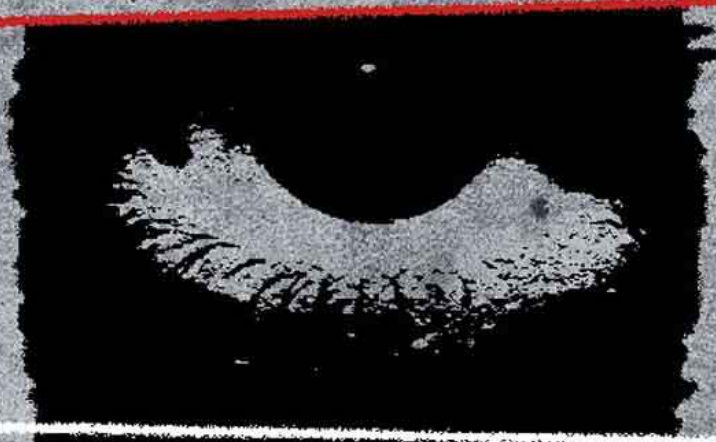

আকাল

সন্তোষ ঢালী

**প্রকাশক**

**বাংলার ই-বই**

**www.banglar-eboi.com**

**সন্তোষ ঢালী**
মা : শ্রীমতীদেবী ঢালী
বাবা : নিত্যানন্দ ঢালী
জন্ম : পয়লা বসন্ত ১৩৭০, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪।
জন্মস্থান : পুকুরিয়া, কদমবাড়ি, রাজৈর, মাদারীপুর।
শিক্ষা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে
বি.এ(অনার্স), এম.এ, বি.এড, এম.ফিল, পিএইচ.ডি।
সংগীত : বুলবুল ললিতকলা একাডেমি থেকে
উচ্চাঙ্গ সংগীতে সার্টিফিকেট কোর্স উত্তীর্ণ।
শখ : গিটার বাজানো, গান করা, আবৃত্তি করা।
তালিকাভুক্ত শিল্পী ও গীতিকার, বাংলাদেশ বেতার।
পেশা : অধ্যাপনা। বি.সি.এস(শিক্ষা)।
কর্মস্থল : সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ;
ঢাকা কলেজ, ঢাকা। বাংলাদেশ।
পুরস্কার : একুশের সাহিত্য পুরস্কার, মুক্তধারা ১৯৯০,
সুনীল সাহিত্য পুরস্কার, মাদারীপুর ২০০৯,
অনুভব সম্মাননা, ঢাকা ২০১৩।
প্রকাশিত বই : ফসিল(কবিতা), অন্তরঙ্গ দ্বৈরথে(গল্প),
প্রপার জন্য পঙ্‌ক্তিমালা(কবিতা),
মন না মতি(উপন্যাস), একলব্যের তীর (কবিতা),
নিলামবালা (গল্প), অচেনা মানুষ (উপন্যাস),
ভুবনডাঙা (কিশোর কবিতা)।

## আকাল সম্পর্কে:

বাংলাদেশের নবীন কবিকণ্ঠ।
ইতোমধ্যে আমাদের কবিতার ধারায় তিনি
নিজস্ব স্বরের কারণে পরিচিত হয়ে উঠেছেন।
এই সময়ের বিচ্ছিন্নতা বিভক্ততা দুরবস্থা আর
দুর্গতির কথা নিয়ে আলোর মুখ দেখছে
সন্তোষের 'আকাল'।
'আকাল' সময়ের কথা, স্বদেশের কথা, স্বজনের কথা।
'আকাল'-ভুক্ত কবিতাসমূহ থেকে সচেতন পাঠক
খুব সহজেই বুঝে নিতে পারবেন
সন্তোষের শক্তির প্রখরতা।
সন্তোষ ঢালীর বলবার ভঙ্গিটা একান্তই নিজস্ব,
ভাষায় আছে চিন্তার ছাপ,
পরিচর্যায় পাওয়া যায় প্রযত্নের পরিচয়।
লেগে থাকলে সন্তোষ টিকে যাবেন
– একথা 'আকাল' পড়ে অনায়াসেই বলা যায়।
'আকাল' পড়ে পাঠক নতুন এক কাব্য-অভিজ্ঞতায়
ঋদ্ধ হবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।
'আকাল' আকালের সীমানা পেরিয়ে ক্রমশ
সুদিনের সম্ভাবনায় রঙিন হয়ে উঠুক,
সন্তোষের কবিতা নিজেকে অতিক্রম করে
ঋদ্ধ হয়ে উঠুক দিন-দিন
– এটাই আমার আত্যন্তিক কামনা।

**বিশ্বজিৎ ঘোষ**
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

**আকাল**
কবিতার ইবুক

**গ্রন্থস্বত্ব**
সংহিতা ঢালী খেয়া

**ই-বুক প্রকাশকাল**
নভেম্বর, ২০১৩
কার্তিক, ১৪২০

**প্রচ্ছদ**
ধ্রুব এষ

**ই-বুক নির্মাণ ও**
**সার্বিক যোগাযোগ**
সৈয়দ রায়হান বিন ওয়ালী
ই-মেইলঃ rayhan_66@hotmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৮১৭৬১৭৭৬৪
ও
আজম মাহমুদ
ই-মেইলঃ ajombd@gmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৭১৫৫৫১৮১৬

**বাংলার ই-বই**
ঢাকা, বাংলাদেশ
www.banglar-eboi.com

# সূচি


| | | | |
|---|---|---|---|
| আকাল | ০৮ | ৪৩ | চোল্‌তার পাতা |
| সকাল হলো | ০৯ | ৪৪ | চামচিকা |
| এ মাটি আমার মা | ১০ | ৪৫ | দুফোঁটা অশ্রু |
| আকাল কড়া নাড়ে দরজায় | ১১ | ৪৭ | চিঠির মৃত্যু |
| স্বপ্ন হারানো মানুষের কথা | ১৩ | ৪৮ | ঝড় নয় |
| কৈশোর | ১৪ | ৪৯ | যদি চাও |
| বৃষ্টি | ১৬ | ৫০ | সোনামুখি |
| মোটেই বিস্মিত হব না | ১৭ | ৫১ | ক্যানিবাল্‌স হোটেল |
| পায়ে পায়ে | ১৮ | ৫২ | মর্গ |
| আকালের ছায়া | ১৮ | ৫৩ | হিজলের ছায়া |
| মেঘ | ২০ | ৫৪ | রঙধনু |
| নদীর কথা | ২২ | ৬৫ | পরিচয় |
| টিকিটটা কার জন্য কাঁটা হলো | ২৩ | ৫৬ | ওমা থেকে |
| ট্রেন | ২৪ | ৫৭ | ছেলেবেলা |
| গোলাপ ও একটি পানপাত্র | ২৫ | ৫৮ | ভূমিকাবদল |
| কেতকী | ২৬ | ৫৯ | নদী |
| পায়রা | ২৭ | ৬০ | কাঁদতে পারি |
| আততায়ী সময় | ২৮ | ৬১ | ইন্দিরা |
| যোগাযোগ রেখো | ২৯ | ৬২ | তানপুরা |
| কোন শালা বলে দেশে দুর্ভিক্ষ নাই | ৩০ | ৬৩ | নিশীথ |
| মরুভূমি | ৩১ | ৬৪ | টবের গাছ |
| বুড়িগঙ্গা | ৩২ | ৬৫ | মধুকবি |
| বঙ্গবন্ধু | ৩৩ | ৬৬ | বৈশাখ |
| মালঞ্চের হার | ৩৪ | ৬৭ | মানুষগুলো |
| শ্যামলতা | ৩৫ | ৬৮ | বৃক্ষজন্ম |
| স্বপ্নপাড়া | ৩৬ | ৬৯ | মন্দাক্রান্তা |
| এখানে কোন মানুষ নেই | ৩৭ | ৭০ | ঈশ্বর দেখে যাও |
| বসুন্ধরা | ৩৮ | ৭১ | জাগ্রত শাহ্‌বাগ জাগ্রত বিবেক |
| শঙ্খশুভ্র হাত | ৩৯ | ৭২ | ক্যাসাবিয়াঙ্কা |
| সিমকার্ড | ৪০ | ৭৩ | হরতালনামা |
| মাঠের কাব্য | ৪১ | ৭৪ | শীত |
| সংসার | ৪২ | ৭৫ | মায়াজলে কালরাত |

**সুমনা**

মহাকালের করতলে কেবলই আকাল

## আকাল

দারুণ আকাল পড়েছে চারদিক
কুষ্ঠ রোগীর মতো আকালের ছায়া পাথারে পাথার
আকাল জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে
গৃহস্থের ঘরে চৈত্র-সংক্রান্তিতে পৌষ-পিঠায় নবান্ন উৎসবে
আকাল অন্তরে অন্তরে কোষে কোষে চৈতন্যের ভাঁজে
মাঠে শস্যের আকাল থালায় ভাতের পোড়া চোখে কালাহাণ্ডি হাসে
আকাশে মেঘের আকাল বৃষ্টিফোঁটা দুঃখ জানায় গাছ-গাছালির কাছে
নদীতলে জলের আকাল জল গেছে নিরুদ্দেশের পথে
ফুল পাখি সবুজের আকাল, আকাল এখন একতারাটির তারে
প্রজাপতির পাখায় কেমন রঙের আকাল বসন্ত-বৈশাখে
গন্ধরাজে গন্ধ যে নেই ঘ্রাণের আকাল ফুলে
আমলকিটির আটির ভেতর শাসের আকাল বুকের ভেতর ঘুণ
আউল বাউল বোষ্টমিদের আকাল গানে মেঠোপথে মহাজনের হাঁচি
মন মানে না জিভের কথা পড়শিতো কোন ছার
মগজে চাতুর্য নাচে বিশ্বাসের আকাল প্রাণে আকাল ভালোবাসার
ঠোঁট থেকে মুছে গেছে পেলবতা হাসির আকাল ভাসে চোখের কিনারে
বুকের ভেতর সুখের আকাল উথাল-পাথাল হাহাকারের ঢেউ
স্বপ্ন দেখার আকাল ঘুমে কাল কেউটের বাস
মানুষ এখন নিজের হাতে সারাবেলা একলা একা ক্ষয়
চন্দ্রকলায় কালো ছায়া বোধের ভেতর হট্টমেলার ভূত
আকাল এখন রাহুর মতো সবকিছু খায় গিলে
মহাকালের করতলে আকাল যেন বিধির লাটিম উন্মাতালে ছোটে।

মানুষ খুঁজি কোথায় মানুষ প্রাণের কাছে ডাকি
মানবতার আকাল এখন বিশ্ব জুড়ে আকাল মানুষেরই।

## সকাল হলো

সকাল হলো।
অন্ধকারে যে আতঙ্ক থাকে ওঁৎ পেতে তারা অদৃশ্য ক্রমশ
সকালটা কেমন চেনা চেনা লাগে
এ শহরে এই প্রথম মেহেদি আলোয় হাঁটছি ভোর ভোর
দোকানপাট এখনও তেমন খোলে নি;
অবশ্য ফুলেরা পাপড়ি মেলেছে দেখেছি কলেজের বাগানে।
একটা লোক হেঁটে আসছে গ্রামের গনিমিয়ার মতো ধুলোপায়ে, খালি
কালো পিচে থোপ থোপ পা ফেলে বহু যুগ দূরের কোন পূর্বপুরুষ যেন বা
তাকে খুব চেনা চেনা লাগে।
মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল প্রাচীন একটা কাক হিতোপদেশের
তাকেও খুব চেনা চেনা লাগছে
মনে হলো ছেলেবেলা থেকে উড়ে এসে
আমাকে স্বাগত জানায় এই শহরে যেখানে আকাশ আর মাঠ নেই।

এই সকালেও একটা মিছিল আসছে কালো কালো মানুষের
সমবেত কণ্ঠের আওয়াজ উঠছে শ্মশানযাত্রীর মতো মৃদু অথচ গম্ভীর
কিংবা শ্বাপদের তাড়া খাওয়া দূর অতীতের গুহামানবের দলীয় ক্রন্দন যেন
'এক হও, এক হও . . . মানতে হবে, মানতে হবে'
আওয়াজটা চেনা চেনা মনে হয় এই অকালেও।

যুগ-যুগান্তর ধরে জেনে আসছি, শুনে আসছি
সব ভাঙছে, টুকরো টুকরো হচ্ছে নিয়ত –
দেশ, মহাদেশ, ধর্ম; মন্দির, মসজিদ, হৃদয়
আর শুনছি – 'এক হও, এক হও'
এ যেন অবিনশ্বর এক বাণী কালের কণ্ঠে।

সবই চেনা চেনা মনে হয় এই দেশ এই শহরে
অথচ নির্মম সত্যিটা – সবই অচেনা।

চেনা চেনা সকাল তবে কি এক সুবিশাল মরীচিকা?

## এ মাটি আমার মা

এখানে এই মাটির গভীরে আমার পূর্বপুরুষের ঘাম
ভূমিপুত্র আমি এই মায়াবতী মাটির
ভেসে আসা ভেলা নই, শেকড়ডুবানো বৃক্ষ
অথচ আমাকেই আগাছা মনে হয় বেলা অবেলায়
জন্মদাত্রী আমার মা নয় – এ তথ্য নির্বোধ বাতাসে ছড়ায়।

আমার মাটি আগুনে পোড়ে অনন্ত সংসার
ধূপের মতো পোড়ে স্বপ্ন সন্তানের ঘুম দধিচীর হাড়
পুড়ে যায় বুদ্ধ মানবতা মানুষের বিশ্বাস
স্থির প্রত্যয়ে আমি অভিমন্যু জ্বলন্ত শিখা বৃত্তের ভেতর
স্বপ্ন জ্বেলে বসে থাকি প্রিয় স্বদেশ।

এ মাটি আমার আমি এই মাটির, এ মাটি আমার মা।
আমি চলে গেলে পদ্মা মেঘনা শীর্ণ হবে সন্তান শোকে
বৃক্ষ পত্রশূন্য হবে, মরা ডালে কোকিল করবে না কুহুতান
আকাশে শকুন উড়বে পঙ্গপালের মতো
আমি ছোট্ট ভূঁইচাঁপা মাটির দায় কোলে তুলবার।

একখণ্ড মানচিত্রে শস্যের হাসি চেয়েছিলাম
চেয়েছিলাম সবুজ বনানীর ডালে পাখিদের মুক্ত ডানা
কালো কালো মানুষেরা প্রাণ খুলে গাইবে স্বপ্নজয়ের গান,
কবে যেন ইচ্ছের মৃত্যু হয়েছে মানুষের
মৃত্যু হয়েছে ফুল পাখি ব্রতচারী আকাশের
শান্তির কথাগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে ক্লিষ্ট জার্নালে।

ধুলোমলিন কিশলয়গুলো কেঁপে ওঠে ডালে ডালে বিষাক্ত নিশ্বাসে
মুক্তির গান শুধু নদীজলে ভেসে যাওয়া দুঃসহ স্মৃতি
স্বাধীনতা শব্দটি এখনও ডাস্টবিনে পড়ে থাকা দোয়েলের শিস্
স্বপ্নবেলা ডাক দিয়ে যায় মিষ্টি রোদের খোঁজে।
মগজে চিরায়ত কুচক্রি হাওয়া অবিরত ছোবল হানে
এখনও যুদ্ধ কোষে কোষে নিউরনে বর্ণমালা জুড়ে
যুদ্ধ বুঝি শেষ হয় না বাঙালির, যুদ্ধ চিরকালের।

## আকাল কড়া নাড়ে দরজায়

একটা সময় ছিল যখন দরজায় কড়া নেড়ে ভিক্ষা চাইত ভিক্ষুক
এখন আর ভিক্ষা চায় না কেউ; ভাত চায়।

বন্যায় উজাড় ফসলের ক্ষেত,
যা-ও বেঁচে ছিল – খেয়ে নিল রাক্ষুসী সিডর;
মানুষ ঘর হারিয়েছে, হারিয়েছে বস্ত্র; স্বজন।
কোথাও দানাপানি নেই এককণা মুখে তুলবার।
আকাল এখন জলে-স্থলে; আকাল কড়া নাড়ে দরজায়।
মানুষ টাকা চায় না, বাসস্থান চায় না;
দারুণ শীতেও শীতবস্ত্র চায় না এক টুকরো;
পশুকেও হার মানিয়েছে তার লজ্জা নিবারণের চেষ্টা,
একমাত্র চাওয়া এখন – একমুঠো ভাত।

শুভ বড়দিন, যিশুর জন্মোৎসবের আয়োজন চারদিক
ঈদের আমেজ, বাতাসে পৌষপিঠার ঘ্রাণ
পৃথিবীতে নতুন বছরের পদধ্বনি –
এমনি এক কুয়াশাচ্ছন্ন রাতে ভাতের থালা সামনে গ্রাস তুলছি মুখে
হঠাৎ গলির বাতাসে অস্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে এক দুর্বোধ্য আওয়াজ –
'চাট্টি ভাত দেবেন কেউ, চাট্টি ভাত!?'

যেন মহাকাল খেপে উঠেছে এমনি কোন আশঙ্কায় কেঁপে উঠি
এত রাতেও মানুষ দরজায় দরজায় ভাত চেয়ে ফেরে?
অথচ পোড়ো বাড়ির মতো বন্ধ দরজা বন্ধই থাকে, খোলে না কেউ।
কুয়াশার স্তর ভেদ করে, রাতের তামাম অন্ধকার চিরে তার প্রগাঢ় কণ্ঠস্বর
মেঘগর্জনের মতো অশনি সঙ্কেত পাঠায়,
কণ্ঠনালী বেয়ে গ্রাস নামে না আমার;

মানুষ হারিয়েছে মানুষের বিশ্বাস
অজানা ভয়ে কোথাও দরজা খোলার শব্দ হয় না।
আর্ত অথচ বজ্রগম্ভীর আওয়াজ আমার দরজায়ও প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে যায়
দরজা খোলা হয় না।

আশ্চর্য !
রাত বাড়লেও জিওলের আঠার মতো সে কণ্ঠস্বর লেগে থাকে আমার দরজায়।

বিছানায় শুয়েও স্পষ্ট শুনতে পাই –
'চাট্টি ভাত দেবেন কেউ, চাট্টি ভাত!?'
আমি ঘুমিয়ে পড়ি, ঘুমের মধ্যে শুনি –

‘চাট্টি ভাত দেবেন কেউ!?’
স্বপ্নের মধ্যে শুনি মহাকালের ওপার থেকে ভেসে আসা আর্তনাদ –
‘চাট্টি ভাত দেবেন!?’

আমি অফিসে যাই, চেয়ার টেবিল চেঁচিয়ে ওঠে –
‘চাট্টি ভাত দেবেন গো, চাট্টি ভাত!?’
আমাকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে শুনতে পাই -
‘চাট্টি ভাত দেবেন গো!?’
সংগীত শুনি, শিল্পী গেয়ে ওঠেন –
‘চাট্টি ভাত দেবেন, চাট্টি ভাত!?’

অন্ধকার রাতের ভিক্ষুক আমার দরজায় সেঁটে দিয়ে গেল মেঘমন্দ্র এক আওয়াজ
‘চাট্টি ভাত দেবেন গো, চাট্টি ভাত!?’

শত ঘষলেও উঠবে না জরুলের দাগ; সে যে কালের কণ্ঠস্বর!
বাঘ ডাকার আগে যেন ফেউ জানান দিয়ে যায় আগাম বারতা;
বাংলার আকাশে বাতাসে এখন একটিই আওয়াজ –
‘চাট্টি ভাত দেবেন কেউ, চাট্টি ভাত!?’

কোন্ অশনি-সঙ্কেত পাঠায় ঘর থেকে ঘরে?

## স্বপ্ন হারানো মানুষের কথা

কবে যেন স্বপ্ন দেখেছি অচেনা প্রত্যূষে
ঘুমচোখে নিটোল কুসুম, স্বর্গীয় রঙ
ছোঁব বলে হাত বাড়াই নির্বোধ বামুন
অনন্ত দূর, পুড়ে খাক বুকের পাঁজর, জ্বলে ওঠে চোখ
সেই থেকে অগ্ন্যুন্মুখ পতঙ্গের মতো সূর্যপিয়াসী
আশা নেই, প্রাপ্তি নেই – ব্যর্থ মানুষ।

কবে যেন স্বপ্ন দেখেছি, মনে নেই ক্ষণ
স্বপ্ন হারিয়েছি কবে, মনে নেই তাও
স্বপ্ন কেমন ছিল, তাও আজ চিতায় জ্বলা ধোঁয়া
স্বপ্নেরা প্রেত যেন পাঁজর খোঁড়ে বেলা-অবেলায়।

স্বপ্ন দেখেছি প্রাণে একটু সবুজ
ঘাসফুল, মেঠোসুর, কৃষকের হাসি
ফসলের ক্ষেতে যেন পঙ্গপাল
স্বপ্ন খেয়ে খেয়ে আকাশজুড়ে ঘনকালো মেঘ
বিরানভূমিতে একা বিবর্ণ মানুষ
স্বপ্ন খুঁজি নক্সিকাঁথায় ফুল-পাখি-লতায়-পাতায়
সুইয়ের ডুবসাঁতারে স্বপ্নেরা সলিলবাসিনী
স্বপ্ন বুঝি প্রজাপতি ফুলে ফুলে ভ্রমণ;
ফুল কই, শুষ্ক ডালে আমার বিচরণ।

নদীজলে নাইতে নামি
স্রোতকে সুর ভেবে সাঁতার কাটি অষ্টপ্রহর
নিরুদ্দেশ ভেসে চলি এ গাঙ সে গাঙ অছুঁৎ লখিন্দর
পূজা-শেষ বিসর্জনের ফুল;
আরতি পড়ে থাকে তীরে।
দূরে, সেখানেই সংগীত মূর্তি হয়ে রয় খোল-করতালের শাসনে।

গণ্ডূষে সমুদ্রপানের স্পর্ধা নিয়ে সৈকতে নতজানু
বইয়ের পাতা থেকে জেগে ওঠা আমি যেন পুরনো মূষিক
জিহ্বায় লোনাজলের দুঃসহ বিদ্রূপ
ঢেউয়ের চূড়ায় স্বপ্ন জ্বলে তিক্ত তামাশায়
আমৃত্যু লোনাজলে ভাসায় ফেনার ছলে স্বপ্ন আমার।

মানুষকে মানুষ ভেবে কাছে যাই, পায়ে পায়ে ধুলোর মতো উড়ি
চকচকে জুতোতে জড়াই ব্রাত্য জীবন
পালিশে মুছে দেয় ধুলো-প্রাণ নিমিষে ফুঁয়ে উড়ায়

উড়ি রঙিন ফানুস নিজস্ব রেখায়
জীবনের বৃত্ত আঁকি মোহের তুলিতে অলীক বুদ্বুদ
আকাশ ঢেলে দেয় কৃষ্ণ তরল
আমার চোখ থেকে ছিনিয়ে নেয় যাবতীয় রঙ।

বারবার চিতায় শুইয়ে দিয়েছি স্বপ্ন আমার করুণ চোখে
মা যেমন সন্তানকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে বিছানায়;
তারপর বিনিদ্র কাটায় রাত বিষাদের সলতে জ্বেলে।
স্বপ্ন আমার বিকলাঙ্গ সন্তান যেন হামাগুড়ি সারাক্ষণ,
পেছন থেকে হাঁড়ি ফাটিয়ে স্বপ্নকে জন্মের মতো বিসর্জন দিয়েছি চিতায়;
কারো কারো স্বপ্ন দেখতে নেই কখনও এ আপ্তবাক্য ভুলে যাই বারবার –
স্বপ্নেই সার্থক স্বপ্ন শুধু জাগরণ প্রহেলিকার ঘোড়া।

পায়ে চলা পথের পাশে ফুটে থাকা ঘাসফুল হতে চেয়েছিলাম শৈশবে
পথিক গেছে পায়ে দলে অবলীলায় রঙিন শৈশব;
কৈশোরে ছোট্ট গঙ্গাফড়িং তিড়িং বিড়িং ঘাসে ঘাসে পাতায় পাতায়
শালিখের হলুদ ঠোঁট ছিঁড়েছে ইচ্ছেডানা আপন খেয়ালে।
ধুলোমলিন আঁচল ছুঁয়ে বলেছি মাকে মাগো,
এ কেমন স্বপ্ন স্বপ্ন খেলা মানুষ খেলে?
স্বপ্নগুলো ছায়াপাখি মিহিন আলোর ভোজবাজি
একটুখানি মেঘের তলে হারায় অনায়াসে
রাত্রি সেতো আছেই কাছে দেখা দিয়ে হারিয়ে যেতে
পেয়ালা ছাপিয়ে স্বপ্ন ফেনিয়ে ওঠে করপুটে।

স্বপ্ন দেখি স্বপ্ন দেখার নেশার ছলে সন্ধ্যা সকাল রাত্রি দুপুর সারাবেলা
স্বপ্ন নিয়ে সাপলুডু খেলি স্বপ্ন শেষে সাপের লেজে
জীবন সেতো আর কিছু নয় অন্যরকম
স্বপ্ন দেখার আজগুবি এক জুয়াখেলা।

## কৈশোর

সেদিনও এমনি বৃষ্টি ছিল ঘরে বাইরে, মেঘের আড়ালে ছিল রোদ্দুর
বুকের খুব গভীরে নিপাট মেঘমল্লার একটানা পাথারপুরে
তুমি কুশিকাঁটায় ফুলতোলা কী একটা বুনছিলে আনমনে;
তখন সদ্য কৈশোর
কুশিকাঁটায় ঢেউ তুলে এফোঁড় ওফোঁড় তুমি কী বুনছিলে নির্মলাদি?
আমার খুব জানতে ইচ্ছে হয়েছিল।
খুব কাছে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম –
চড়ুই পাখির মতো তোমার দুটো হাত, লাউডগা সাপের মতো কিলবিল আঙুল
খেলা করছিল আলপনার দুপুরে

আমি কিছুই জানতে চাই নি অনেক কিছু জানতে চেয়েও।

নির্মলাদি,
তোমার চারপাশ ঘিরে কেমন ছাতিম ফুলের গন্ধ নাচছিল
ওই কৈশোরেও আমার মাথার মধ্যে ভোমরার ভোঁ ভোঁ, আদিগন্তহীন মাঠ
প্রজাপতির রঙিন পাখায় মন, ছুটছি নওল কিশোর;
কুশিকাঁটায় এফোঁড় ওফোঁড় তুমি কী বুনছিলে নির্মলাদি?
সে কি কোন মোহনীয় বেদনাবিলাস, নাকি আমার কৈশোর?

নক্সিকাঁথার মতো সারাদিন কুশিকাঁটায় এফোঁড় ওফোঁড় হই
আমারই কৈশোর জুড়ে তুমি ফুল তোল, কাঁটালতার বাসনা আঁকো
শ্রাবণের চালতা ফুল, শরতের কাশফুল, হেমন্তের ছাতিম;
তুমি ফুল তোল গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত অনাদি অনন্তকাল জুড়ে;
আর প্রান্তরে প্রান্তরে চৌরাশিয়ার বাঁশিতে রাতভর মিশ্র খাম্বাজ পৃথিবীর কোলে –
রাতের নক্ষত্রের প্রাণে শিশিরের শিহরণ;

কী মনে করে তুমি চোখ তুলে তাকালে একবার বহুকাল পরে
দিগন্তের ওপার থেকে মেঘের মতো কোন এক বর্ষায়
বললে – কী চাস্ তুই?
চাতক আমার চোখে নিরুত্তর উচ্চারণ – কৈশোর।

নির্মলাদি, আমার ফুলতোলা কৈশোর
তুমি আমায় ফিরিয়ে দেবে না?

# বৃষ্টি

বৃষ্টি দেখেছিলাম ছেলেবেলায় টিনের চালে ঝমঝম
আকাশ উপুড় হয়ে গদ্যের মতো সারাদিন অন্ধকার,
বৃষ্টি দেখেছিলাম কলাপাতার সবুজে নামকীর্তনের মতো
উঠোনের জলধারায় বুদ্বুদের কাহিনীতে;
ধাপের পাটক্ষেতে পুবান বাতাস যেন কোলাহলে মাতে
বৃষ্টি দেখেছিলাম জলজ পাথারে কচুরির চোখে
সারাদিন টিপটিপ গুমগুম তন্দ্রাকাতর আলস্য।

হঠাৎ কখনও দুচোখ ঝেঁপে বৃষ্টি এল ভুঁইচাঁপাদের বনে
বৃষ্টি নেমেছিল এক বর্ষায় নির্মলাদির কাজল কালো চোখে
কী জানি কোন্ দুঃখ নাকি আলতো করে ছুঁয়ে গিয়েছিল তাকে,
বৈকুণ্ঠপুরের পথে দেখেছিলাম মাতাল মাদল বৃষ্টি,
আকাশ উজাড় করে দিয়ে ছোট্ট আমার বুকখানা দিত কানায় কানায় ভরে
ছোট্টবেলা বৃষ্টি হত মজার মজার করে
মনের সাথে মিল ছিল তার হৃদয়ে ছিল ভারি ভীষণ যোগ,
আজকালকার বৃষ্টিরা সব ছন্নছাড়া হতচ্ছাড়া
তাদের কাছে মানব মনের নেই কোন আর দাম।

বৃষ্টিরা কি রাগ করেছে মানুষ, পাখি, বন-বনানীর কাছে
তাই বুঝি আজ ছন্নছাড়া, যা ইচ্ছে তাই খুশি মনে করে?
বৃষ্টিরইবা দোষ কী বল, সময় গেছে পাল্টে
মানুষ এখন সভ্য হয়ে আপন বুকের পাঁজর খোঁড়ে নতুন নতুন লোভে
হয়তবা তার সময়ও নেই রঙধনুটার রঙ মেখে গায় একটুখানি ভেজার
বৃষ্টি দেখার মন মানুষের হয়ত গেছে পচে।

বৃষ্টি ছিল আমি ছিলাম উঠোন ভরে ছিল মনের যোগ
যা হারাবার হারিয়ে যায় বৃষ্টি ঠিকই চেনে পোড়া চোখ।

# মোটেই বিস্মিত হব না

আজ আর বিস্মিত হই না অকস্মাৎ নক্ষত্র খসে গেলে।
নদীরা মরে যাবে, মানচিত্র বদল হবে পুরনো নিয়মে,
বড় স্বাভাবিক যেন সবকিছু আজকাল জোয়ার-ভাঁটার মতো;
আমি বিস্মিত হই না মোটেই।

সারা বাংলা যদি টেংরাটিলা হয়ে জ্বলে
আমি মোটেই বিস্মিত হব না;
হাসপাতালগুলো যদি হয়ে যায় কসাইখানা,
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অস্ত্রের কারখানা,
আমি বিস্মিত হব না আর;
প্রত্যেক শিশুর কাঁধে প্রতিটি স্কুলব্যাগে
যদি লুকোনো থাকে গ্রেনেড কিংবা বোমা,
প্রত্যেক নদী যদি রক্তে পূর্ণ হয় লাল তাজা রঙে
আমি বিস্মিত হব না একটুও।
গুঁড়ো দুধের বদলে শিশুরা যদি মুঠো মুঠো বারুদ খায় চিবিয়ে,
ভাতের বদলে মুঠো মুঠো কাঁকর,
আমি মোটেই বিস্মিত হব না।

আমি বিস্মিত হব না এক বিন্দু আর
মানুষের মুণ্ডু কেটে স্কন্ধে লাগিয়ে দিলে কোন বাইসনের মাথা
কিংবা বুক চিরে বসিয়ে দিলে নেকড়ের হৃদয়;
আমি বিস্মিত হব না মোটে
বাংলাতে যদি একটি বাংলা শব্দও আর না পাওয়া যায় খুঁজে;
আমি বিস্মিত হব না
বাঙালি যদি চিরতরে হাসতে যায় ভুলে।

এ কোন খেদের কথা নয়, নয় আত্মদহনের চিৎকার
নষ্ট সময়ের নষ্ট মানুষ, কষ্টে গাই নষ্টের গান –
পায়ে পায়ে বেজে যাক মৃত্যুর ঘুঙুর,
আমাদের শব ঘিরে উড়ুক শকুন।
রাঙামাটির লেকে জলের তলে
ডুবে যাওয়া চাকমা রাজার প্রাসাদের মতো
সারা বাংলা যদি চিরতরে যায় গহন অতলে ডুবে
বিস্মিত হব না মোটেই;

তবুও ওপর থেকে দেখা যাবে শহিদমিনার কিংবা স্মৃতিসৌধের চূড়া
তার শিখরেও হয়ত থাকবে বসে বলদর্পী দুএকটি শকুন
প্রত্যাশা – যদি আর একটা কোন লাশ ওঠে ভেসে,
যদি সেই ভেসে ওঠা লাশটাও হই আমি –
মোটেই বিস্মিত হব না আর, আমি বিস্মিত হব না মোটে।

# পায়েপায়ে

কতদিন এই পথে হাঁটি না
খালিপায়ে সবুজ ছুঁয়ে ছুঁয়ে বহু বহু দূর
মানুষের মনের মতো মাঠগুলো ছোট হয়ে গেছে
গরুও চরে না কোন, সেই রাখালও নেই,
আজকালকার বাঁশে বাঁশি হয় না, লাঠি হয়।

বটের ঝুরি নদীতে নেবে গেছে কবে যেন চুপিসারে
মাটির নিচ থেকে খুঁজে নেবে অলস জীবন
তোমাকে প্রথম স্পর্শের মতো গোপন কিছু খইফোটা দুপুর
এখনও রয়ে গেছে বুকের তলে
বুড়ো বটের ঝুরি পায় না নাগাল সেই প্রত্ন-শরীর
সে এখন উয়ারী বটেশ্বরের আরও গভীরে পুরাকালের ধ্বংসাবশেষ
মনে আছে, কোন নদী ছিল না তবু সাঁকো ছিল এইখানে?
মিঠে রোদে এই নির্জন মাঠে ছিল স্বপ্নের পারাপার
ওরা এখনও পায় নি সে সাঁকোর সন্ধান,
দৃষ্টিতে ঝুলে আছে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ।

পৃথিবী ছাড়া আর কোথাও এমন সুবোধ ঘাস নেই
যেখানে আকাশের দিকে মুখ করে নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকা যায় কয়েক জীবন
একটা একটা করে তারা ফোটার আলো চোখে জমিয়ে ঘুমিয়ে পড়া
এখন আর তেমন কারো অবসর কই?

কত বৈষ্ণব পদাবলির রাত পার করে দিয়েছি মুঠোয় রেখে নয়নতারা ফুল
দুর্বাঘাস টিপে টিপে বের করেছি কত দুধসাদা বিকেল
জোনাকির পথ ধরে পায়েপায়ে চলে গেছি গা ছমছম তেঁতুলতলা
সে সব রয়েছে আজও মরচেধরা কৌটোর অন্ধকারে –

তুমিও রয়েছ ওখানে ছোট্ট এক ঘুণপোকা যেন
অবিনশ্বর। মৃত এক নক্ষত্র অনন্ত আকাশে।

## আকালের ছায়া

ঢেউ তুলে আর কোন নদী এসে সহসা দুচোখে
দাঁড়ায় না বিকেলের আবছায়া মাঠের দুয়ারে
শিস্ ভুলে নাড়ামাঠে পড়ে থাকে দোয়েলের কাদামাখা ঠোঁট;

আহা রে জীবন, তুই নিমতেতো বিবর্ণ-বাসরে
কোন্ ঘরে ভালোবাসা চির অফুরান?
সমাজের কোন্ দোষে জলসীমা, নদীশাসন?
হয়তবা ভালোবাসা হয়ে গেছে অকালে প্রয়াণ
পাখিরাও উড়ে গেছে দূরদেশে প্রান্তর ছেড়ে
পাথারে পাথারে শুধু আকালের ছায়া –
কী এমন ক্ষতি বল ঘাসফুল বিকশিত হলে
মেঘ চায় জোয়ারের জল ছুঁতে আষাঢ়-বেলায়
দরদি বাতাস জানে সেইসব কথা
কানে কানে ফিস্ ফিস্ বেদনাবিলাস
হায় রে জীবন, তুই শিশিরের গান
পায়ে পায়ে বেজে যাস অলীক ঘুঙুর

সময়ের দারুণ অসুখ বুঝি
ঢেউ এসে বলে নাই মনের কথাটা।

## মেঘ

মেঘ –
প্রিয় বন্ধু, আশ্চর্য সাথি আমার
সত্তায় মিশে থাকা রঙ; স্বর্গীয় সিম্ফনি।
কখনও শান্ত স্নিগ্ধ ছায়াময়, কখনও গুরুগম্ভীর
গর্জনে; কখনও মিহিন নূপুর পায়ে আস তুমি,
কখনও নিঃশব্দে আস সন্ধের মতো অস্তিত্ব জুড়ে;
আমি টের পাই – আগমন মৃদু হোক যতই ।

কী এক অপূর্ব মিল দুজনার যাপিত জীবনে –
পথহারা, গৃহহারা চির প্রবাসী একাকী পথিক;
হৃদয় আমার ডানার ভাঁজে ভাঁজে তোমার গোপন
কন্দরে লুকিয়ে থাকে প্রণয়ের জলে
মানুষ দেখে না সেই প্রণয়কলা তাদের
জাগতিক চোখে;
আমারও তেমন কোন স্বদেশ নেই
খুঁজে দেখেছি মনে মনে
কোন সীমানা কিংবা কাঁটাতারের বেড়া
অথবা স্থায়ী কোন ঠিকানা
কাঁসর বাদ্য থেকে আযানের ধ্বনি
কিংবা গির্জার ঘণ্টা থেকে প্যাগোডার রণন
স্বদেশের সীমানা একাকার সর্বত্র
মেঘ, পাখি, কবিদের কোন দেশ থাকে না।

চির বন্ধু, চির সাথি, মনে পড়ে – মুগ্ধ শৈশব
উঠোন ফুঁড়ে যেই সোঁদা মাটির গন্ধ-বকুল
বাতাসে ভুঁইচাঁপার মাতাল মাদল
বুকের ভেতর বাইরে যাবার ছলাৎ ছলাৎ ডাক
ফোঁটায় ফোঁটায় শরীর ভিজিয়ে তোমাকে আবাহন
কী আনন্দ, কী উল্লাস ! হা কৈশোর বৃষ্টির গানে জুঁইফুলের নাচ
দিগন্তে তুমি যখন কালবৈশাখী
ছোট্ট শিশুর মতো বাবার খাতায় দোয়াত উল্টে আসো
বিস্ময় চোখে দেখি আকাশ ছেঁড়ার মহিমা
তুমি আসবে কী ভয়ঙ্কর আয়োজন, রুদ্র তেজে
গাছ-পালা, ঘর-বাড়ি, পাখির সংসার সব
লণ্ডভণ্ড করে; ভাঙা-ডানা পাখিরা
আশ্রয় খুঁজবে ভীত চোখে জেনেও
বুকের ভেতর লক্ষ সমুদ্রের তরঙ্গ-গর্জন
প্রতিটি কোষে কোষে উল্লাস

তারপর তছনছ প্রকৃতির পরতে পরতে
ছেঁড়া পাতা, ভাঙা ডাল; টিনের চাল
মানুষের ছড়ানো ছিটানো স্বপ্নের ভেতর তোমার অস্তিত্ব
তুমি এসেছিলে বজ্র-বিদ্যুৎ সাথে মহাতেজে
অসীম দুঃখের ভিড়েও ভাবতে ভালো লাগে।

আকাশগঙ্গা ছাড়া আর কোন নদী ছিল না আমার
তোমার ভেলায় ভেসে ভেসে সেই নদীতে অনন্ত সাঁতার,
বিকেলের আকাশে তুমি কখনও ঘোড়া,
কখনও বাঘ, কখনও বন-জঙ্গল-পাহাড়ের
ভেতর বিশাল এক হাতি আমার বাহন হতে
তোমার পিঠে চড়ে নক্ষত্রের দেশে ভ্রমণ
চির অন্ধকারের দেশে খুঁজেছি উৎস আলোর
তোমার কল্যাণে আকাশচারী;
আজও কৃষ্ণগহ্বর হাতছানি দেয় অসীম পাথারে
ঠোঁটে বিদ্যুৎরেখা এঁকে তুমি হাসো
অদ্ভুত অশরীরী বন্ধু আমার।

যখন ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে অমেয়ধারা ভালোবাসা তোমার
হৃদয়ে প্লাবন ডাকে উথাল পাথাল ঢেউ
নদীতে নাইতে নামি আজন্ম শিশু শুদ্ধ শান্তিতে
সে কী ডুবসাঁতার একলা একা সারাটা বিকেল
চারপাশে কত সুখ কত আনন্দ
সহস্র বুদ্বুদের অবিরাম ফোটা আর ফেটে পড়া
আনন্দ ছুঁতে ছুঁতে আনন্দ মিলিয়ে যাওয়া
জীবনের এ এক পরম সত্য উপলব্ধ কানায় কানায়;
মন্দ্র-মন্থর কণ্ঠ তোমার ডেকে ওঠে গুমগুম গুরুগম্ভীর
বুকের গভীরে অলৌকিক শিহরণ যেন চিতল মাছের ঘাই
কখনও কাঁপন জাগে রোঁয়া ওঠে দেহে
রাতের মতো দীর্ঘ দীর্ঘ ছায়ায় ভিজি তোমার ভালোবাসাধারায় আমৃত্যু
পৃথিবীর আকাশ জুড়ে শ্রাবণ শুধু আর সব মিছে
আনন্দ-বেদনার এমন দ্রবণ বুঝি তুমিই দিতে পার উপহার;

জলদ, প্রিয় সাথি, নূপুরের মতো বেজে যাও, বেজে যেও
যাপিত জীবনের উঠোনে উঠোনে বেহাগে-বিলাপে
অনুদিন অনুক্ষণ স্নিগ্ধ তন্দ্রার ঘোরে।
ল্যাপটপ ভিজে যাওয়া এই ডিজিটাল সময়ে
যেখানে আকাশ আর মাঠ নেই শিশির নেই ঘাসের ঠোঁটে
বন্ধু বাজো, আমাকে বাজাও; বাজাও কৈশোর তালে –

## নদীর কথা

কতকাল পরে নদীর সাথে দেখা
নির্বাক চেয়ে থাকা কাতর চোখে – চিনতে পারো কি এই অবেলায়?
ছলাৎ ছলাৎ জলের চোখে মৃদু আকুতি
'একদিন গঙ্গা ছিলাম অশান্ত যৌবনে'
খুব চেনা মনে হলো যে রকম মনে হয় পাণ্ডুর স্মৃতি
বালুচরে জমে আছে অনেক সাঁতার
থোকা থোকা ক্যাকটাস কেয়ার কাঁটা
কিছু ঝিনুক কাঁকড়ার খোলস মরা বিকেল
কত খুনসুটি ঢেউয়ের আঁচল জুড়ে সায়াহ্নের অবকাশে
আজ সে শ্মশানঘাটা কবে যেন গেছে চলে লোকালয়ে এই আকালে
বটতলা পড়ে আছে বৈষ্ণবীর খঞ্জনী ভাঙা বাঁট একতারার।

হৃদয় গচ্ছিত রেখেছি মাছরাঙার ঠোঁটে
মরাডালে বসে থাকে অনাদি আকাল অলস ভঙ্গিমা
নদীতীরে মহাকাল বুক খুলে নাচে।

ভালো আছো নদী, এইসব মরা কাটালে?
ভালো আছো, এই অনন্ত আকালে?

## টিকিটটা কার জন্য কাঁটা হলো

কখনও কখনও সংশয়কাল জমাট অন্ধকার
আমি যেন ক্ষুদ্র এক মাকড়সা নিমজ্জিত অন্তহীন অতলে
তমসা, ও তমসা – কেন কর গ্রাস এমন অজীবে?

মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সকালের রোদ্দুর
জীবনভর আলো-ছায়ার খেলা
পেছনে তাড়া করছে অফিসের সময়, হন্তদন্ত পৌঁছনো বাসের লাইনে।
তুমি দাঁড়িয়ে ছিলে আগেই, যেন আমার প্রতীক্ষায়, হাতে দুটো টিকিট
কী যে ভালো লাগল তখন!
অথচ আমাকে দেখেই কেমন চমকে উঠলে, পাংশু হলো মুখ
ভুল পথে অনেক হাঁটার পর হঠাৎ কালবৈশাখী যেন।
আষাঢ়ের মেঘেওতো বিদ্যুৎ খেলে, তেমনি একটু হাসির ঝিলিক মাখালে ঠোঁটে
দ্রুত ঘড়িতে রাখলে চোখ, তাকালে পথে, সে এল
যেন মেঘ নয়, এবার রোদ্দুর
বললে – দাঁড়াও আর একটা টিকিট কেটে আনি।

ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল বুকভরা আগুন নিয়ে
দৃশ্যগুলো উড়িয়ে এনে উড়িয়ে নিয়ে গেল তুমুল হাওয়া চোখে
আমি জানালার পাশে, তারপর তুমি
ওপাশে বসল সে দূরের কাছে নক্ষত্রপ্রায়।

আড়চোখে মাঝে মধ্যে তাকালে আমার দিকে
মামুলি কথাবার্তা দুএকটা খুঁটে খাওয়া দানাপানি
তার সাথে খই ফোটালে অনন্ত
শিরায় শিরায় আমার যন্ত্রণার নদী পাড় ভাঙে অবলীলায়;
কাটা দুটো টিকিট দেখে মনে যে লতানো সবুজ
নিমিষেই পুড়ে হলো ছাই।

ভরা নদীতে জাগে প্রশ্নবোধক চর –
টিকিটটা কার জন্য কাটা হলো?
টিকিটটা কার জন্য কাঁটা হলো!

## ট্রেন

সেই ট্রেনটির সাথে আমার দেখা হয় প্রতিদিন
হৃদয়ের পাশ দিয়ে যার যাতায়াত বেলা-অবেলায়,
এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে, আবার ফিরে আসে আগের স্টেশনেই
ঠিক যেন রক্তস্রোতের মতো
হৃৎপিণ্ড থেকে দূরে গিয়ে আবার হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসা।
ছেড়ে যাওয়া স্টেশনটির নাম সকাল, আর পৌঁছনোটি সন্ধে।
সকাল থেকে সন্ধের দিকে যায়, আবার সন্ধে থেকে ফিরে আসে সকালের দিকে
গন্তব্য সকাল না সন্ধে তা রহস্যে ঢাকা;
অথবা সকাল থেকে সন্ধে, সন্ধে থেকে সকাল শুধু গন্তব্যই খোঁজা
মাকুর মতো এপাশ ওপাশ।

বুকের ভেতর মহাকালের মতো শিস্ দিয়ে যায় ধুক্‌পুক্ ধুক্‌পুক্ শব্দ তুলে
ট্রেনটি আমার বন্ধু যেন
কোন এক অদৃশ্য ইশারায় ডাকে বিশ্বভ্রমণে
মনটা আমার ব্যাকুল হয়, বিকল হয়
অদৃশ্য ট্রেনের যাত্রী হই অবচেতনে যেন বেভুল পথিক
ট্রেন চলে কু ঝিক ঝিক ঝিক কু ঝিক ঝিক ঝিক –

এমনও ট্রেন হয় যার কোন চালক থাকে না
যাত্রীও শুধু একলা একা আমি !

## গোলাপ ও একটি পানপাত্র

(এ. কে. এম. কামরুল হক, সুহৃদ সহকর্মী)

তুলা রাশির জাতক-জাতকী
তেইশ বসন্ত পেরুনো কোন সন্ধ্যায়
ছায়াতরুর কিনারে একান্তে, জন্মদিনে
তেইশটি গোলাপ তুলে দিল জাতকীর হাতে
প্রত্যুত্তরে আনত চোখ আর মৃদু নিঃশ্বাস।

ঘুরে ফিরে জাতকের জন্মতিথি
মেয়েটি নিয়ে এল সাতটি গোলাপ
লুফে নিল বুভুক্ষের মতো
আঙুলে দেখা দিল রক্তকলি অকস্মাৎ
উঃ! বলে জাতকী চুষে নিল লবণাক্ত উষ্ণতা
কোমল জিহ্বায়
সার্থক জন্ম হলো গোলাপ-কাঁটার
জাতকের মনে হলো – গোলাপের চেয়ে কাঁটাই সুন্দর।

দিন যায়, যায় মাস, বছর –
পঞ্জিকার পাতায় আবার জাতকের জন্মতিথি
এবার গোলাপ নয়, নয় কোন বিষাক্ত কাঁটা
উপহার সুদৃশ্য পানপাত্র আর একটি লাইটার।
তারপর জাতকী দূরের নক্ষত্র হয়ে ছায়াপথবাসী
জাতকের হৃদয়ে অনন্ত রক্তক্ষরণ।
সে ভুলেছে পানপাত্র তুলে দিয়ে জন্মের মতো
জাতক নেশায় বুঁদ, পানপাত্র জাতকীর জ্বলন্ত স্মৃতি;
রক্ত থেকে যায় না মোছা রক্তের দাগ।
হেমন্ত এলেই ঘাসের কাছাকাছি শিশির আসে
শিউলিরা জুটে যায় নিঃসঙ্গ ভোরে
ধনুরাশির আরেক জাতকী কামশর হাতে
সামনে দাঁড়ায় দেবদূতীর মতো
জাতকের চোখে নেশার ছোবল
জন্মদিনে তাকে দেয় সাতটি গোলাপ নিষ্কণ্টক
রক্ত ফোটে না আর হাতে
বিষ নেই, সাদামাটা, এ কেমন নিরুত্তাপ গোলাপ?
নিত্য তবু তাকেই ব্যবহার –
তুলারাশির জাতকী পানপাত্র রেখে
চলে গেছে দূরে কাঁটা নিয়ে সাথে

এ কেমন গোলাপ গোলাপ খেলা নিত্য নিশিদিন
কাঁটাহীন, জ্বালাহীন – কার ভালো লাগে?

# কেতকী

আষাঢ় আসবে তবু রথের চাকায় মেঘ বাজবে না, সে তো হয় না।
সেতারের ঝালায় ভিজতে ভিজতে পৌঁছে যাই কখন যে তোমার দুয়ারে
দেখি তুমিও কণ্টকশাসনে ভেজা কেতকী দূর সেই প্রবালদ্বীপে;
সমুদ্রে নিম্নচাপ, তিন নম্বর বিপদসঙ্কেত
এ বর্ষায় লোনাজল বাসা বাঁধবেই ঈশ্বরীর ঘরে।

ভাঙা ঘর, চালার ফাঁকে গড়াবেই জল ফোঁটায় ফোঁটায়
মেঘের বিছানা তরল সুখের খাটালে
একটানা মেঘমল্লার নিপাট বুকের ভাঁজে হুহু দাদুরী
ক্রন্দনই সত্য মহাকাশে ফাটল দেখে বৃক্ষের ক্লেশ
সুখের করাতে ফোটে স্বর্গীয় ফুল।

ক্যাকটাসকাঁটার মতো বৃষ্টি নিয়ে আষাঢ় নামে এ ডালে সে ডালে
পাঁজর বিদ্ধ করে রক্তকণার গোপন ক্ষরণে
আমি দেখি কেতকীর ভেজা বুকে কখন জাগে সুখের কাঁপন
কখন ভাঙে ঘুম নৈরাশ্যের তীরে;
তন্দ্রার ভেতর টের পাই সুরভি বিথার,
কণ্টকশাসনে ভেজে কেতকী একা সমুদ্র-দূরে –

## পায়রা

কী অপূর্ব ছিল বিকেলটা সোনাজলে ধোয়া
নদীর চড়ায় পড়ে থাকা ঢেউয়ের মতো কিছু কিছু স্মৃতি
পিয়ানোয় তুলছিল টুং টাং স্বর্গীয় সুর
সন্তর্পণে তুমি এলে ঝরা পাতার মতো আমার ঘরে
খাটে নয়, পালঙ্কে নয়, মনের জানালায় বসেছিলে শুভ্রতা ছড়িয়ে।

দুহাত বাড়াতেই কাছে এলে দেবদূতী
অস্ফুট কথামালা মন্দ্রস্বরে বেজে গেল বুকের গভীরে
কী বলতে চাইলে চোখ এবং ঠোঁটের ইশারায় ঘাড় কাৎ করে
আমি যেন বোঝা না বোঝার শৌখিন পেণ্ডুলাম
কবে থেকে দুলছি মৃদু জলতরঙ্গ স্নিগ্ধ আলোয়
শরীরে ছোঁয়ালে কোমল বুকের কী দারুণ ওম।

কখনও কাঁধ ছুঁয়ে কখনও মাথায় রেখে পালক
কখনও আনমনে বসে থাকো জানালার পাশে
সারাদিন ঘুরে ফিরে সন্ধেয় আমার পাশে নিয়মমাফিক
এভাবেই দিন কাটে কাটে রাত সময় গড়ায় –
কী এমন দুঃখ জমেছিল একদিন ডানা দিলে মেলে,
অপেক্ষায় অপেক্ষায় ক্লান্ত সন্ধ্যা শুষে নিল রাত
তারপর বোঝা গেল পালকের ভাঁজে নিয়ে চলে গেছ ঘুম।

ঈশ্বর দুডানায় গচ্ছিত রেখেছিল ওড়ার মহিমা
বুঝি নি পাখিতো একদিন উড়বেই বনের মায়ায়
গৃহকোণে পড়ে রবে একটি পালক ছোট্ট শুভ্র নির্মল স্মৃতিখণ্ড।

## আততায়ী সময়

ছেলেবেলার পাঠশালা, নামতার হিসেব
এখন ঘুণপোকা কুর্‌কুর্‌ ভুল
লাউলতা সাপের মতো বেত তুলে গুরুমশাই বলতেন –
'ওরে মূর্খ, দিনের পরে যেমন রাত
রাতের পরেও তেমনি দিন, রাতকে ভয় কেন?'
সেই সত্য গচ্ছিত বোবা জোনাকির মনে, কানে কানে কথা।

জোনাকির কাল শেষ গুরুমশায়ের সাথে
গ্রামগুলো সাবালক, ঘরে ঘরে বিজলী বাতির ছুরি,
সভ্যতা অজগর বাসন্তীকে গেলে নিসর্গ বিকেল
নীতিকথা মলাটবন্দি উইপোকা আলপনা কাটে।

আমার বোধ সেই সম্বোধনের বুমেরাঙ চিতার দিকে ছোটে
যেখানে দাউদাউ গুরুমশাই ফোঁটা ফোঁটা একলা সময়
অগ্নিকাঠে চাপা
দৃশ্যপট পাল্টে পাল্টে যায় –
রাতের পরে দিন নয়, আরও গাঢ় কোন রাত
মেঘের আড়ালে মেঘ, ছদ্মবেশী মেঘ
রাস্তার মোড়ে মোড়ে ওঁৎ পাতে আততায়ী সময়
মগজে ঘুণ ... কুর্‌কুর্‌ ... কুর্‌কুর্‌ ...
প্রতিদিন খুন হয় একলা আকাশ।

# যোগাযোগ রেখো

(শিল্পী সঞ্জীব চৌধুরী)

কাছাকাছি থাকলেও মানুষের সাথে এখন মানুষের দেখা হয় না খুব একটা
চলতি পথে দুএক নিমেষ মৃদু হাসি কুশল বিনিময়
প্রতারক সময়ের ফাঁদে ব্রাত্য জীবন;
হঠাৎ কোন সন্ধ্যায় কিংবা অপরাহ্নের ম্লান আলোয় দেখা হয় সঞ্জীবদার সাথে,
দীর্ঘদিন পরের তেমনি কোন এক দেখা হওয়ায়
সঞ্জীবদা বলেছিলেন – যোগাযোগ রেখো।

এরপর কয়েক বসন্তের বিরতি
যোগাযোগ শিকেয় তোলা হাঁড়ি।
বঞ্চনা, অনেক রক্তক্ষয়, সমুদ্র উঠে এসেছে মানুষের ঘরে,
কুণ্ডলায়িত ধোঁয়ার মতো মানুষের বিশ্বাস আলপথে নাচে;

সঞ্জীবদা, নবান্নের উৎসব পায়ে দলে এরই মধ্যে আপনার আকাশগঙ্গা পাড়ি
যোগাযোগের সমস্ত সুতো ছিঁড়ে আপনি আশ্চর্য ঘুড়ি;
লাটাই হাতে আমি এক অবোধ কিশোর ভুবনডাঙার মাঠে
আকাশপারে অন্তহীন খুঁজি দিগন্তের ওপারে উড়ে যাওয়া সুখ;
যাবার আগে একবারও বলে যান নি যোগাযোগের উপায়,
সুতোর প্রান্ত ধরে আজ আমার দীর্ঘ প্রতীক্ষা সায়াহ্নের মাঠে
ইথারে ইথারে আপনার কণ্ঠ অপূর্ব ইন্দ্রজাল –
'একখানা মেঘ ভেসে এল আকাশে', 'বঁধুয়া আমার চোখে জল এনেছে হায়'

সুতোছেঁড়া ঘুড়ি ফেরে না জেনেও কি দুফোঁটা মেঘ জমবে না চোখে?
সঞ্জীবদা, চোখের জলই হোক তবে যোগাযোগের সেতু।

## কোন শালা বলে দেশে দুর্ভিক্ষ নাই

একটা পাগলের সাথে আমার দেখা হয় প্রায়ই।
দেখা হয় রাস্তায়, বাজারে; গোরস্থানে, হাসপাতালে
ম্লান হয়ে আসা নদীতীরে, শ্মশানঘাটে;
ক্ষিধে ছাড়া আর কোন জ্বালা নেই তার।
গভীর রাতের কুকুর যেমন হঠাৎ আর্তনাদ করে ওঠে
মাঝে মাঝে সে চিৎকার করে ওঠে তেমনি –
'কোন শালা বলে দেশে দুর্ভিক্ষ নাই?'
তার চিৎকার মেঘগর্জনের মতো আছড়ে পড়ে কাল থেকে কালান্তরে
প্রান্তর থেকে প্রান্তরে।

মানুষের পকেট কবে যেন গড়ের মাঠ হয়ে গেছে,
পথিকের চেয়ে ভিক্ষুকের সংখ্যাই বেশি এখন।
সেনাদের দোকানের সামনে দীর্ঘ চালের লাইন
দিগন্ত ছুঁয়ে যায় নিমেষেই;
দিন শেষে কালো কালো কঙ্কালসার হাত শূন্য ফেরে
আগামী সকালের চালের লাইনের আশায়।

ঘরে ঘরে অন্নকষ্ট, কালাহাণ্ডির মাঠ
কাক, কুকুর, মানুষ এখন পাশাপাশি খাবার খোঁজে ডাস্টবিনে,
দুর্ভিক্ষের সংজ্ঞা না জানা মূর্খরা তবুও বলবেন 'দেশে দুর্ভিক্ষ নাই'।
পাগলটা শোনে, মিটিমিটি হাসে আর চিৎকার করে বলে ওঠে –
'কোন শালা বলে দেশে দুর্ভিক্ষ নাই?'

## মরুভূমি

বালি আর লোনাজলের খেলা ছাড়া অন্য কোন খেলা নেই এখানে।
আমি আগামী পৃথিবীর কথা বলছি –
মানুষের বর্জ্য বয়ে বয়ে নদীগুলো ক্লান্ত
সবুজের চির নির্বাসন বনভূমি থেকে
মানুষগুলো কেমন পশুর মতো দিনরাত খাদ্য খুঁজে খুঁজে হয়রান
চারদিকে মরুর আগ্রাসন।

জলের গান সুদূর অতীত
বাতাসে হাড়ের বাদ্য মহাকাল জুড়ে
বালুকণায় মৃত্যু নাচে তাতা থৈ থৈ, তা থৈয়া থৈয়া কৎ
একটু ছায়ার খোঁজে মানুষেরা চণ্ডালিকা গগন ফাটায়,
কোথাও শান্তিবৃষ্টির খবর মেলে না।

এসো, আমাদের শুষ্ক জিহ্বার আলপনা এঁকে দেই
শুষ্ক মরুর শুষ্ক বালির বুকে,
এ আমাদের এবং আমাদের পূর্বপুরুষের প্রায়শ্চিত্ত।

# বুড়িগঙ্গা

নদী কী করে নর্দমা হয় এ ব্যাকরণ জানে নগরবাসী
উচ্ছল গঙ্গা যায় মহাপ্রয়াণে
জঞ্জাল যত, মানুষের যাবতীয় বর্জ্য
অবজ্ঞায় উৎসর্গ পবিত্র জলধারায়
জলও পচে নাগরিক যন্ত্রণায়, পুঁতিগন্ধময় নরকের নদী
স্রোত নেই, ঢেউ নেই, এ যেন বৃহৎ এক ড্রেন
মাছ নেই, সাপ নেই, জলতলে নেই কোন প্রাণের স্পন্দন
এমনও নদী হয়?
ছিন্নমস্তার জিভের মতো দুপাড় থেকে ক্রমশ এগিয়ে আসে
মানুষের লোভ মাঝনদী সীমানায়
নিঃস্ব ভিখারির মতো ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণ তনু
এ আমাদেরই প্রিয় নদী বুড়িগঙ্গা।

হাসতে হাসতে যে জাতি জাতির পিতাকে করে খুন,
মায়ের সম্ভ্রম হারানোর বেদনা অবলীলায় যে জাতি যায় ভুলে,
স্বজনের লাশের উপর দাঁড়িয়ে যে জাতি এজিদের মতো উল্লাসে পড়ে ফেটে;
নদীকে লাশ বানাবে সে – এ এমন কী আর কষ্টকল্পের!
বুড়ো হলে মাও বুঝি পরিত্যক্ত হয়
এ সত্য বাঙালির অভিধানে মেলে।

অদূর ভবিষ্যতে বাংলার শিশুরা তাদের পাঠ্য বইয়ে এ তথ্য পাবে
এইখানে এক নদী ছিল এইসব সুরম্য অট্টালিকার নিচে
হরপ্পা নয়, মহেঞ্জোদারো নয়
বাংলার আর এক সভ্যতার কালে
ঐশ্বর্যদাত্রী এক নদী ছিল, ছিল প্রাণের শিহরণ
রুপোলি ইলিশ ছিল, জাহাজের নিত্য চলাচল
মহাকালের ধুলোতলে নদীটির কঙ্কাল আজ ফসিল হয়ে আছে।
শিক্ষকের বেত্রতাড়নায় শিশুরা মুখস্থ করবে –
ঢাকা বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত (ছিল)!
বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ঢাকা অবস্থিত (ছিল)!

## বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আজও কোন কবিতা লেখা হয় নি আমার
দানাবাঁধা বরফের মতো ভাবনাটা ঝর্ণা হলো না আজও
এই মৃত সূর্যের অস্তমিত আলোয়।

ছেলেবেলায় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে
চুল ব্যাক-ব্রাশ করে হতে চাইতাম স্বপ্নের পুরুষ
কণ্ঠস্বর নকল করে বিকেলের মাঠে মাঠে একা একা বক্তৃতা, অবুঝ বালক
'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।
একটি অঙ্গুলি হেলনের দৃশ্যে কী জাদুকরী শক্তি
আজও বিস্মিত করে আমাকে।

কিছু কিছু শেয়ালেরা এখনও অপরিহার্য মনে করে পনের আগস্ট
প্রকাশ্য দিবালোকেও দন্ত বিকশিত হুক্কাহুয়া ডাক,
আদিম নেকড়েরা খুন ভালোবাসে
ফুল বা সংগীতের চেয়ে নরমাংস পছন্দ ঢের;
পিতৃপুরুষকে অস্বীকার করে কেউ কেউ জারজ হতে চায় আপাদমস্তক
রিরংসার সুখ আছে এইসব কূটনৈপুণ্যে,
সত্যের চেয়ে মিথ্যেই প্রিয় তাদের, সভ্যতার চেয়ে বর্বরতা
আলো নয়, অন্ধকারই প্রিয় শ্বাপদের।

কাব্য আসে না কোন শ্বাপদ অরণ্যে
সন্ত্রস্ত পাখি আটকে আছে কঠিন খাঁচায়
বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আমার কোন কবিতা লেখা হবে না কোনদিন
তিনি নিজেই এক স্বয়ম্ভু কবিতা স্বয়ংসম্পূর্ণ,
পরম বন্ধুর মতো থাক সে আত্মার গভীর অস্তিত্বকণা হয়ে
থাক সূর্যোদয়ে বাংলার প্রতি ঘাসে ঘাসে
শিশিরবিন্দু হয়ে সমুজ্জ্বল।

## মালঞ্চের হার

খালি গা, হাফ প্যান্ট পরা
আর কোন পোশাক নেই তার পরনে।
একা একা সাজ-সজ্জা পথের পাশে
মেয়েটি মাথায় টিকলি পরল, কানে পরল দুল
চিকন দুটো হাতে নিটোল দুগাছি বালা
তারপর গলায় চড়াল শখের নেকলেস,
বস্তুত সবই ছিল মালঞ্চের লতা।

ডায়েট কন্ট্রোল নয়, কণ্ঠার হাড় এমনিতেই জেগে
পেটটা যেন সারেঙ্গি দুবেলা দুমুঠো জোটে না খাবার
মনে তবু শখ আছে গলায় চড়াবে মালঞ্চের হার,
মুখ তার মেঘের ফাঁকের চন্দ্রকলা ময়লা জমে জমে
জোটে না লাক্স কিংবা তিব্বত এক টুকরো সুগন্ধি সাবান
নদীর পচাজলে স্নান যখনই চাইবে মন
সর্দি-জ্বরও হার মেনেছে ওই মেয়েটির কাছে।

পেটের ক্ষিধে হার মেনেছে শখের ক্ষিধের কাছে
সোন-রুপা-হীরে কিংবা মুক্তা নেই প্রয়োজন
সবুজ গাঁয়ের অবুঝ মেয়ে ভুলতে পারে ক্ষিধের জ্বালা
পারে না ভুলতে শখের অলঙ্কার।

বাংলার রূপসী মেয়ে পায়ে পায়ে ছড়িয়ে যায় রূপ ঘাসে ঘাসে
নিত্য অভাব, পেটে প্লীহা, শীর্ণ দেহ তবু দুপা ছড়িয়ে সাজে
চরম দুঃখেও আনন্দ উপচে পড়ে কাজল-কালো চোখে
মাঠে মাঠে প্রান্তরে শিশিরে তার সূর্য হাসে।

## শ্যামলতা

জানি না কেমন আছে শ্যাম পিসি দূরে,
নিম তেতো জীবনের ভার বয়ে একা একা গোধূলির পারে।
স্বামী তার মারা গেছে ঝড় জল রাতে,
ভেঙেছে হাতের শাঁখা কিশোরী বেলায়;
সিঁথির সিঁদুর মুছে গাঙুরের জলে
সে এখন ভাসানের একাকী বেহুলা,
ঘর নেই ধুয়ে গেছে পোতার মমতা
ছেলেমেয়ে কোলে পিঠে বেঁচে থাকা দায়।

জমি নেই, ধান নেই, দারুণ অভাব
জোটে কি জোটে না তার শাক পাতা মুখে
শ্যাম লতা শ্যামলতা হারায় নিমেষে।
শেয়াল শকুন তার চারিপাশে ঘোরে
কবে কোন আঘাটায় মরে রবে একা
এদেশের বেহুলারা এভাবেই বাঁচে।

## স্বপ্নপাড়া

এই বাতাস যদি সোহাগে বিলি কেটে চুলে
ঘুম পাড়িয়ে রাখে মায়ের মমতায়
ডেকো না আমাকে।

এই অবিন্যস্ত গাছপালা, ঊদার মাঠ
থোকা থোকা ফুলের মতো দূর দূর বাড়ি
আমাকে স্বপ্নপাড়ায় ডাকে।
মেঘনায় গলে যাক শেষ সূর্যের রঙ
সাইরেন বাজিয়ে ছেড়ে যাক শেষ বিকেলের তরী
আসুক মৃত্যুর মতো অন্ধকার ঘন
আমি যাব না, যাব না কোথাও এই স্বপ্নপাড়া ছেড়ে।

এই বাঁশবন, চিনা-কাউনের ক্ষেত, হিজলের ছায়া
যদি চোখের পাতায় ঢেলে দেয় ফোঁটা ফোঁটা ঘুম
দূরের মাঠে বেজে ওঠে রাখালের বাঁশি
শেষ খেয়া চলে যায়, যাক
ডেকো না আমাকে এই অলস বিকেলে।

এই মাঠ মাঠ ঘাস বিছায়েছে শীতল পাটি
ঘুমের আয়োজন, আমাকেই হাতছানি
আকাশের প্রান্ত থেকে কণা কণা স্বপ্ন খসে
ফুলের পরাগ কিংবা শিশিরের মতো আমাকেই ঢেকে দেয়;

এর চেয়ে পরম শান্তি
মাটির গন্ধমাখা উদাস বাতাস, এমন স্বপ্নপাড়া
কোন দেশে আছে?

## এখানে কোন মানুষ নেই

আমি ঠিক জানি না, কী নাম এই জনপদের;
এখানে কোন মানুষ নেই।
চারদিকে সব ওরাং-ওটাং, বানর, গিরগিটি
আনাচে কানাচে শেয়াল, হায়েনা
শকুনও দেখা যায় দুচারটে –
কী নাম এই জনপদের, আমি জানি না।

কোন ইতিহাস নেই এখানের, নেই সভ্যতা
আছে রক্তমুখী নদী; ভগ্ন প্রাসাদ;
প্রাসাদের গায়ে রক্তের আলপনা
প্রান্তরে প্রান্তরে স্বার্থপুষ্ট ফসল।

মাৎস্য নীতি ছাড়া অন্য কোন নীতি নেই এখানে
শ্রদ্ধা, সত্য, বিশ্বাস – এদের কাছে প্রাচীন পুঁথি,
প্রাণে গোপন রেখে প্রাণের কথা প্রাণ খুলে হাসে
অর্বাচীন জনপদের এইসব আজব প্রাণী;

এখানে কোন মানুষ নেই
মানুষের পক্ষে এরকম পাষণ্ড হওয়া সম্ভব নয়।
এ কোন জনপদ, কী নাম; আমার জানা নেই
শ্বাপদ ছাড়া আর কোন প্রাণী নেই অদ্ভুত এই দেশে।

## বসুন্ধরা

মা আমার, মাটি আমার, প্রিয় বসুন্ধরা
জানি, তুমি সর্বংসহা; লেশমাত্র কষ্ট-ব্যথাতীত অহল্যা পাষাণী,
মূঢ় সন্তান বোঝে না মায়ের বেদনা; নির্বোধ সে, মাতৃঘাতিনী
প্রতি মুহূর্তের সংগ্রামে পাথরেও রক্তপ্রপাত, বিক্ষত ধরিত্রী স্বপ্নচাষীর ছোবলে;

পৃথিবীর প্রতি মুষ্টি ধূলি আমার, আমি সন্তান পৃথিবীর;
দায়ভার নিয়েছি তুলে কাঁধে মাথা পেতে জন্মান্তরের পাপের।
জলধারা বিদ্রোহ করে আজ আসমান-জমিনে
ধেয়ে আসে সুনামি নগর অভিমুখে সহস্র ফণা তুলে বাসুকী নাগ
রামের পদরেণুস্পর্শে ঘুমভাঙা অহল্যার মতো বসুন্ধরা ক্রমশ আড়মোড় ভাঙে
মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে, নড়ে ওঠে; উগরে দেয় ভেতরের অগ্নি-যন্ত্রণা
মৃদু শাসনে তিরস্কার করে মূঢ় সন্তানে,
আমারই কর্মের ফলে স্বপ্নশস্য নষ্ট হয়, জননীর ক্রোধে পোড়ে সবুজ বনানী
মানুষের অন্তিমকাল আসন্ন হয় দ্রুত অগ্নিরথের চাকায়;
মা আমার, প্রিয় বসুন্ধরা, এখনও নাবালক মানুষ বোধের বিপণনে
মানুষ কখনও সভ্য হবে না নিশ্চিত বলে দিতে পারি মৃত্তিকা ছুঁয়ে
মানুষের পুঞ্জীভূত পাপের পরিণাম আলপথে নৃত্য করে প্রদোষকালে;

নদীদের মৃত্যু হবে, বনভূমি উজাড়
ভৌগোলিক সীমারেখা মুছে গিয়ে একাকার মানচিত্র সমুদ্রজলে;
মানুষ তবু চাঁদে যাবে, পারমাণবিক মহড়া চালাবে মহাকাশ জুড়ে
পাখি হবার সাধনায় ডানাকে বানাবে উড়ন্ত সসার
জলসীমা নিয়ে যুদ্ধ হবে, যুদ্ধ হবে আকাশ নিয়ে আকাশে আকাশে
বিশ্রামের জন্য কোন বৃক্ষ পাবে না সলিলমরুতে
প্রকৃতির প্রতিশোধ চূড়ান্ত হবে অনাগত ভবিষ্যতের ভ্রূণে
সর্বংসহা ধরণীরও ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে সুনামিসঙ্কল্পে।

এ আমার প্রায়শ্চিত্ত পাপের মা আমার,
এ মাটি আমার, আমি এ মাটির
হিমালয় থেকে লোহিত সাগর, এন্টার্কটিকা থেকে এস্কিমোদের ইগলু
সমগ্র মানচিত্র আমার দেশ,
মেঘের মতো ভেসে ভেসে শস্যকণায় শোনাব বৃষ্টির গান
অতঃপর পরমায়ুর মতো নিঃশেষিত হব জন্মের ঋণে।

তবুও মানুষ নির্বোধ থেকে যাবে কালের উপকণ্ঠে ধ্বংসস্তূপের শীতলতায়
পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারে শুনবে মৃত্যুর গান সমুদ্রফেনায়,
মা আমার, মহামৃত্যু নাচবে, মহামৃত্যু নাচবেই কালের ফণায়।

## শঙ্খশুভ্র হাত

মেয়েটার হাত ধরবার জন্যে কী চেষ্টাই না করে যাচ্ছে নিয়ত
কিছুতেই পারছে না ছুঁতে ওহাত ছেলেটা
বারবার চেষ্টা করে যায় ব্যর্থ কামনায়
দুটো হাত খুব কাছাকাছি এসে থেমে থাকে মৃত মানুষের হাতের মতো
কোনভাবেই আর এগোয় না
কী প্রাণান্ত প্রচেষ্টা!
মেয়েটারও একই দশা
দুজনের কাউকেই দেখা যায় না
দৃশ্যমান শুধু দুটো অলৌকিক
শঙ্খশুভ্র সুন্দর নিটোল হাত;
হাত দুটো মিলিত হবে বলে
বাতাসে টুংটাং জলতরঙ্গ পিয়ানোর মৃদু ধ্বনি
তারপর সব স্থির মায়াবী আলোয়।

ঘটনাটা বারবার ঘটছে চোখের সামনে
বন্ধ সিম চালু করতে গিয়ে আমারই মোবাইলে।

# সিমকার্ড

কেউ চলে গেলে তার নম্বরে ফোন করি না
যদি আর বেজে না ওঠে কিংবা মিহি ধ্বনিত হয় 'দুঃখিত'
অথবা সন্তানের কণ্ঠে জাগে বিষাদী বেহাগ,
তবু জানতে ইচ্ছে হয় সিমকার্ড কী করা হয়?
মানুষটার মতো তাও কি বন্ধ হয়ে যায় চিরতরে?
ঘুমায় অন্ধকারে, নাকি ছাই হয় আগুন মেখে?

সিমকার্ডের মেমোরিতে কত নাম, কত স্মৃতি,
ডিলিট না করা কত মেসেজ শুকনো খড় বিচালির মতো পড়ে থাকে
মুঠোফোনের কাব্য থাকে, প্রিয়জনের ছবি
সন্তানের হাসিমাখা মুখ
সব মুছে যায় নিমেষেই মানুষটার মতো মানুষটার সাথে
এক জীবন ছোট্ট এক ফুঁয়ের সমান।

আমি চলে গেলে তোমরা ফোন করো আমার নম্বরে
শুনিয়ে দেব একলা একা বিষণ্ন গলায়
'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে'
অপরাহ্নের গান –

আমার সন্তান বলে দেবে সিমকার্ডের রহস্য।

# মাঠের কাব্য

ধানকাটা শেষে নাড়ামাঠে ঝরাধান কুড়াবার হেমন্ত-বিকেলে
দিনের চিতা জ্বালাবার বিষাদকালে
কবিতারা পাখা মেলে প্রজাপতি যখন
পদ্য যেনবা শিশির হয়ে এঁকে দিত রাতের ক্যানভাস –
মাঠের কাব্য হত –
একদিন কবিতাই ছিল তার একমাত্র ডিঙা
সে এখন কবিতা লেখে না, ঘোর সংসারী
পাকাধানের বুকে শোনে বিবেকের গান
শিখে গেছে জীবনযাপন কৌশল অক্লেশে,
মাঠের গন্ধ আর উদাসী করে না তাকে অমনি বিকেলে
কবিতার চেয়ে শস্যের সনদ কাম্য এখন মূর্ছনার সংসারে।

বুকের ভিতর বিকেলের পাথার পুষে সঙ্গোপনে
সে এখন অদ্ভুত চাষী জীবন ফলায়
খাতার কবিতার মতো মাঠে মাঠে রোদেলা হাসি
সবুজের ঢেউ শস্যের সংগীত।
তবু তার কী এক নির্মল কষ্ট হৃদয়ে চঞ্চু ডুবায়
নিদাঘ দুপুরে অচেনা কাঠঠোক্‌রা যেনবা –
শস্যদানায় লুকনো মৃত্যুর রহস্য লালনীল আলপনা আঁকে
ই সি জি'র ক্লান্ত কাগজ জুড়ে।

সে এখন কবিতা লেখে না জীবনের রেখচিত্র আঁকে।
আর স্বপ্নের অলীক বারান্দায় ছায়াপাখির অঙ্ক কষে।

## সংসার

ঘরের মতো এত শান্তি নেই কোথাও –
ঘরের মতো এত অশান্তিও নেই কোথাও।
মুদ্রার অপর পিঠের মতো কথাটা উল্টো করেও বলা যায়
কিংবা বিষ পান করতে করতে অমৃতের কথা মনে করা
কপটতার মতো সত্য অদৃষ্টের দোহাই
ঘরের মতো এত অশান্তি নেই কোথাও –
ঘরের মতো এত শান্তিও নেই কোথাও।
এত শ্রান্তিও কোথাও নেই।

## চোল্‌তার পাতা

হাতের তালু চুলকায়, রোজ
সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায়, রাতে
আর সেই প্রবাদটা মনে করে সুখ পাই
'হাতের তালু চুলকালে হাতে টাকা আসে'।
মনের সুখে হাতের তালু চুলকাই
টাকা আসবে বলে দিবাস্বপ্নে বিভোর থাকি ;
চুলকাতে চুলকাতে হাতের ছাল তুলে ফেলি
কোন টাকা আসে না, কোন টাকা এল না।
সুখে হাতের তালু চুলকাই, আর
তিনি – দ্বিতীয় ঈশ্বর আসবেন বলে হাত মেলে থাকি
হাতের ছাল বাকল সব যখন তুলে ফেলি
হাতের তালুতে আঁকি রক্তের আলপনা
যন্ত্রণার ক্ষতে লবণদানা,
তখন সংবিৎ ফিরে পাই –
পকেটে আমার চোল্‌তার পাতা ছিল।

## চামচিকা

গায়ের আটপৌরে গন্ধ বলে দেয় স্মৃতির মতো পুরনো সে
মহাকাল খসে খসে পড়ে পাখার ঝাপটায়
খসে খসে পড়ে দীর্ঘকালের জমানো অন্ধকার
চামচিকা –
থেমে যাওয়া জীবনপ্রবাহের শেষ চিহ্ন;
রাজা যায়, রাজ্য যায় – চামচিকা টিকে থাকে
জীবন-মৃত্যুর এক আশ্চর্য পেণ্ডুলাম বুড়ো কড়িকাঠে।
রাজা ছিল, রানি ছিল, ছিল নূপুরের নিক্কণ
এই প্রাসাদে একদিন – ছিল হাস্যকলোচ্ছ্বাস
আজ মৃত সে প্রাচীন প্রাসাদ
চামচিকা বেঁচে রয় সাক্ষী কালের।

প্রত্ন প্রেতের মতো মৃত আত্মারা প্রাচীনের কাছে
প্রাসাদ ভালোবেসে কিংবদন্তি দীর্ঘশ্বাসের দুপুর,
সেইসব পুরনো গন্ধ জমা চামচিকে-পাখায়;
রক্তরসের স্বাদ পচে গন্ধ পাড়ি দেয় দূর কালে
বিলাসকলায় যা ছিল প্রাণময় একদিন,
আমাদের দীর্ণ করে।

কৈফিয়তের দরজা পেরিয়ে ধ্বংসস্তূপের কাছে
পৌঁছে যায় রাজার বিলাস চামচিকা হয়ে;
প্রাণ ছিল, প্রাণ আছে মৃতের শহরে।

## দুফোঁটা অশ্রু

পুরনো ধুলো ঝেড়ে তানপুরাটায় টোকা দিলে কেমন টনটন বেজে ওঠে কষ্ট
পুরনো ক্ষত, পুরনো ব্যথাও স্মৃতির ধুলো ঠেলে বেরয় রক্তাভ আভায়।
সাঁইত্রিশ বছরেও শেষ হয় না মুহূর্তের গল্প
এখনও ললাটে লেগে দুফোটা অশ্রুর উষ্ণতা –
সেদিনও কি বর্ষার মুখরতা ছিল আকাশে আকাশে
নাকি মানবিক উষ্ণতা ছিল পৃথিবীর ভাঁজে ভাঁজে,
আজ আর মনে নেই সে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুন
রয়ে গেছে দুফোটা অশ্রুর উষ্ণতা ছোট্ট পৃথিবীতে।

অক্টোপাসের মতো বর্ষার জলধারা বেষ্টন করে ফেলে ক্ষেত-খামার
নিঃশব্দ পদচারণায় ঢুকে পড়ে আঙিনার সীমানা পেরিয়ে গেরস্থালির দরজায়
অতি সহজেই মানুষের কাছাকাছি পৌঁছে যায় অমানুষ
পশুদের কোন দেশ থাকে না, পশুদের কোন মা-বোন থাকে না,
পশুদের থাকে না কোন ঘর, সংসার কিংবা সন্তানের মমতা
তাই একাত্তরের আকাশ জুড়ে ওরা ওড়াতে পারে আগুনের নিশান
গাঙের জলে রক্ত ঢেলে হোলির উৎসবে মাতে আদিম পিশাচ।

বনপোড়া হরিণীর মতো ওপারে ছোটে মানুষ ঝাঁকে ঝাঁকে মুঠোয় নিয়ে প্রাণ
রাত গভীর হলে নৌকোর ছলাৎ ছলাৎ ক্রমশ মিলিয়ে যায় পশ্চিমের পথে
কোথাও টিমটিম পিদিম জীবনের ইঙ্গিত দান করে তরঙ্গে দুলে দুলে
সহস্র সহস্র মানুষের নিঃশব্দ করুণ আর্তনাদ ডুবে যায় বৈঠার ছলাৎ ছলাতে
অশ্রু মিশে যায় গাঙুরের জলে
স্মৃতির ক্যানভাসে তারই এক মুহূর্তের চিত্র মাসিদের চলে যাওয়া শিকড় ছিঁড়ে
বিবর্ণ, ধুলো-মলিন স্থির সময়
জলরঙে আঁকা সেই কষ্টের রাগিণী বেজে ওঠে সেতারের ঝালা।

নুহের নৌকায় যখন ভাসছে জীবন এমনি এক কৃষ্ণ রাতে
মাসিদের যাত্রা-বিরতি ক্ষণেক শিশু আমি'র প্রান্তে,
কান্নার সুর চোখ থেকে সরিয়ে দেয় ঘুমের চাদর
একদলা কষ্ট জমাট বরফ হয়ে আটকে থাকে বুকে
চোখ মেলা হয় না, কোন কথা সরে না মুখে,
শিশুটি বুঝতে পারে মৃত্যুর মতো দূরে চলছে স্বজন –

সেই প্রথম উপলব্ধি শেষ বিচ্ছেদের, প্রিয়জন হারানোর ব্যথার অনুভব সেই প্রথম
কেরোসিন বাতির মশাল তুলে মুখের উপর ঝুঁকে জনমের মতো দেখে নেয় আত্মজন,
নীহারিকাপুঞ্জ থেকে খসে পড়া নক্ষত্রের মতো জ্বলন্ত দুফোঁটা অশ্রু
কপালে এঁকে দেয় স্থায়ী বিচ্ছেদ টীকা অব্যয়, অক্ষয়
দুফোঁটা তপ্ত অশ্রু হয়ে একাত্তর কপাল জুড়ে আগুনের শেকড় গাড়ে

সেই স্মৃতি আজ কাঁটাবৃক্ষ মাসিরা সুদূর অতীত
নিরুদ্দেশের নৌকায় মিশে যায় অচেনা অন্ধকারে –

বেসুরো তানপুরার মতো চারপাশ জুড়ে গুমোট কান্নার সিম্ফনি
ঘরখানা শ্মশান যেন বুক চাটে অজানা আতঙ্ক।

শিশুটি সাঁইত্রিশ বছর পর বুঝতে পারে
গুমোট কান্নার সিম্ফনি আজও তার চারপাশ জুড়ে
স্বজনেরা আজও পালায় নিরুদ্দেশের পথে জমে থাকা অন্ধকার চিরে
একই হায়েনা তাড়া করে, একই শকুন নানা তামাশায় থাবা তোলে,

পশুদের অভয়ারণ্যে নিজকে বিপন্ন এক শব ছাড়া কিছুই মনে হয় না।

# চিঠির মৃত্যু

'আপনার কত চিঠি আসে, কত কত লোকে
আপনাকে লেখে' – আপনি বলেছিলেন একদিন
ব্রীড়ায় আনত – 'শীত বিকেলে পাতা ঝরার মতো
লাল খামে, নীল খামে, খয়েরি কিংবা গোলাপি খামে
কত চিঠি উড়ে উড়ে আসে'; আরও বলেছিলেন
'কেউ কখনও লেখে না আমাকে'।
বলেছিলাম – 'আমি লিখব'।

রঙ ছড়াবে যেদিন বোগেনভোলিয়ার শাখা
গোলাপে-সবুজে একাকার ফুলপাতা;
হঠাৎ যেদিন বৃষ্টি ফোঁটায় মাটি থেকে বেরুবে
সোঁদা গন্ধের কোরাস
কিংবা আকাশ-মাটিতে তুমুল শিলাবৃষ্টি
সেদিন লিখব চিঠি লাল-নীল রঙিন কাগজে।

একথা শোনার পর আপনি কিছুটা ম্লান
কিংবা কাচপোকার নির্জনতায় মগ্ন
কী মনে হলো, প্রশ্ন ছুঁড়ে দিই –
'কোন ডাক নাম আছে কি আপনার'?
ছুঁয়ে দেয়া লজ্জাবতীর মতো বললেন –
'লাজুক' দ্বিধা নয়, তবে দ্বিধার মতো শিল্পকলায়।

তারপর কেটে গেছে বহুদিন,
ঘুণপোকা খেয়ে গেছে বিনম্র রাত।
এক অদ্ভুত বিকেলে মরা গাছের ডালে ফিঙে নাচায় লেজ
ও বাড়ির ছাদের আড়ালে কোন সমুদ্র নয়
তবু শেষ আলো ছড়াতে ছড়াতে ডুবে যায় ডিমের কুসুম
পাথর চোখে দেখতে থাকি গায়ে তার এক বিন্দু কালো –

আমার চিঠি লেখার আগেই
আকাশ-বিশাল কালো বিন্দুর বিস্তার মুছে দেয় ভাবনার রঙ
চিঠিটার মৃত্যু হয়।

## ঝড় নয়

গাছটার চেয়ে ছায়াটাই যেন প্রিয় হয়ে ওঠে কখনও সখনও
যেমন তোমার হাসিটা তোমার চেয়ে
চাঁদটার চেয়ে লাজনতা জ্যোৎস্না।

নদীটার কাছে গিয়ে বিস্ময় বালকের মতো ছুটে
চেয়ে থাকি, দেখি তার ছলাৎ ছলাৎ চলা
গণ্ডূষে পান করি কাকচক্ষু জল
জলটাই প্রিয় যেন নদীটার চেয়ে।

ঝড় ডাকি, আয় ঝড় – কাল বৈশাখী
দোয়াত উল্টে কালি ঢেলে আকাশ করে কালো
খলবলিয়ে বিদ্যুৎ হাসে
বাতাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে ওড়ে পাখি আর ঘুড়ি
মানুষের স্বপ্ন, ঘর-বাড়ি
তারপর স্তব্ধ সব, যেন ধ্যানমগ্ন যোগী
মনে হয়, ঝড় নয় –
ঝড়শেষের শান্ত স্তব্ধতাই ভালোবাসি।

সুখগুলো মুঠো পুরে দুঃখের আরতি সাজাই
গল্পের সাজি থেকে ভুলগুলো তুলে নেই অকপটে
সাতরঙ ছেনে আনা জীবন পড়ে থাকে বালুচরে
নদী চলে নিয়তির তালে
মৃত্যুই প্রিয় যেন জীবনের চেয়ে।

## যদি চাও

যদি চাও, মুহূর্তে হয়ে যাব আষাঢ়ের নিশিজাগা মেঘ
অঝোরে ভিজায়ে দেব মাছরাঙা ডানা;
বুকের ভিতর কু ঝিক ঝিক প্রণয়কলার দুরন্ত রেলগাড়ি গন্তব্যহীন –
আমাদের সময়গুলো উথাল পাথাল, সুনামি হবে;
যদি চাও সমুদ্র এনে দেবো বারান্দার কাছে।
কলাপাতার সবুজে সিম্ফনি হবে অনিবার,
দূরের তিমিরে একা ডাহুকের ডাক শুনে হয়ত
হৃদয় থেকে মুছে নেবে নির্জনতার ঘ্রাণ,
ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিতে বেহাগের রঙ মেখে একলা আকাশ হবে।

যদি চাও, নিজেই তানপুরা হব বুকে শূন্যতা পুরে,
সময়কে দীর্ণ করে শোনাব সমুদ্র-সংগীত অনন্ত
হতে পারি চন্দনের চিতা অলীক বৈকালে তুমি যদি চাও
একটু একটু করে পোড়ার ভেতর সুখের যন্ত্রণা আছে।
দীর্ঘ বেঁচে থাকার ভেতর মৃত্যুর ঘুণ নির্বিঘ্নে বাড়ে
তার হিম হিম ছোঁয়া ডেকে আনে হেমন্তবিকেল
যদি চাও হেমন্তের মাঠ হব সোনালি শূন্যতায়,
বুকের ভেতর পাথার পুষে রাখার মধ্যেও সুখ আছে।

## সোনামুখি

ছোট্ট একটা সোনামুখি পাখির খোঁজে উদয়াস্ত বৃক্ষযাপন
অরণ্যে অরণ্যে একা বিচরণ
অদ্ভুত সব মায়াবী আলো চারপাশে খেলে
বৃক্ষেরা সবুজ হারিয়েছে অনেক আগেই
মরে গেছে কবেই শিশিরের গান;

মৃত অরণ্যে তবু সোনামুখির খোঁজ
পাখিটা ছিল কি কখনও পাঁজরের ডালে!

# ক্যানিবালস হোটেল

কোন মফস্বল শহরের রাস্তা যেন
পাশেই সুদৃশ্য হোটেলে ঝুলছে ঝলসানো মাংস
হাত-পা-কলজে-থাই-মগজের চচ্চড়ি
টাঙানো ব্যানারে লেখা বাতাসে পতপত –
'এখানে বোমায় পোড়া মানুষের মাংস পাওয়া যায়'
নির্ভেজাল প্রমাণের জন্য থরে থরে কাচের শো-কেসে
সাজানো রয়েছে ছেঁড়া-রক্তাক্ত
আধপোড়া জামা-কাপড়; হাড়-গোড়; মাথার খুলি,
ঝলসানো চুল, ভাঙা চশমা, দাঁত;
উড়ছে ধোঁয়া, গনগনে চুল্লি;
গন্ধ এসে খামচি মারে নাকে –

আদা আর পেঁয়াজ কুচির সাথে ঝলসানো মাংস,
শিকে পোড়া কাবাব, টিকিয়া, কাঁটা চামচের শব্দ;
আঙুরলতায় থোকা থোকা হৃৎপিণ্ড করুণ,
আলো-আঁধারির ভৌতিক তামাশা;
প্লেটের ওপর নৃত্যরত সুস্বাদু স্বপ্ন –
অন্য কোন জগৎ , অন্য রকম বাংলার দীঘল শহর
তৈরি শুধু নির্জনতা আর অন্ধকারের গলিত দ্রবণে;
অদ্ভুত রাতের কোন প্রেতমায়া তামাম শহর চাটে জৈবিক বিলাসে।
আমার বাংলা কি তবে এক ক্যানিবালস হোটেল?

# মর্গ

তিন তিনটে লাশ ঝুলছিল গাছে কাকভোরেই
পচা গলিত। ফোঁটা ফোঁটা দুর্গন্ধ পথের উপর,
‘বাতাসে লাশের গন্ধ’ জ্বেলে গৃহবন্দী আমি।
একা।

টগবগে যে যুবকটি এইমাত্র দেখা করে গেল হাসিমুখে
সেও এখন গাছের মগডালে ধুঁধুলের মতো ঝুলছে,
এখনও হাসি লেগে গৈরিক ঠোঁটে মোনালিসার মতো,
অন্য দুজন বিকৃত।

এমনি করে যদি শুরু হয় সকাল বিকেলটা কেমন যাবে?
গলিত লাশের গন্ধ মেখে সারাদিন বেঁচে থাকা
নাকি সারাটা জীবন লাশকাটা ঘরের ভুবন?
পাতায় পাতায় মৃত্যুধ্বনি কত্থক নাচে –

কী ব্যাখ্যা দেবে স্বপ্নতাত্ত্বিক মর্গের ওমে,
মৃত্যুই সত্য, বেঁচে থাকা সত্য নয় এ সংসারে?

## হিজলের ছায়া

তিন পুকুরের হালট সেখানে হিজলবনের ছায়া
স্নিগ্ধ জমাট ঠাণ্ডা এবং অন্ধকারের মায়া।
হিজলফুলের গন্ধ এবং ঘুঘুর ডাকের লয়
নির্ঘুম সেই একটু দুপুর কী গা ছমছম ভয়।
দিনের বেলায় নিশি ডাকে যেন হাতছানি দিয়ে কাছে
বাছা, দেখে যারে ঝুলিতে আমার কত কিছু জমা আছে।
ঘন সবুজের ফাঁকে ফাঁকে কালো কালো কোকিলেরা ডাকে
গায়ে কাঁটা দেয় যমদূত ভেবে তাকে।
একা একা ঘুরে সারটা দুপুর হিজলের বনে বনে
কত কিছু ভেবে মনে,
ক্লান্তির মতো নিরালা খুঁজেছি ঝাঁঝাঁ দুপুরের কোলে
পায়ের তলায় হিজল পাতার কান্নার ধ্বনি দলে।
মা যে একা একা বিছানায় শুয়ে দুপুরের ভাতঘুমে
জানে না ছেলেটা হিজলের বনে শুয়ে আছে ছায়া ভূমে
হিজলের ফুল পড়েছিল ঝরে টুপ টাপ টুপ গায়ে
স্নিগ্ধ মধুর বায়ে।
সেই ছেলেবেলা হিজলের বন দুপুরের ঘন ছায়া
বিদায় নিয়েছে জন্মের মতো, রেখে গেছে শুধু মায়া।
হাতছানি দিয়ে নেই কোন আর ডাক
থাক ছেলেবেলা হিজল পাতার তলাতেই চাপা থাক।

## রঙধনু

রঙধনুটা মুছে গেল সন্ধ্যারাগের ধূপছায়ায়
ছোট্ট করে ডেকেছিলাম তোমাকে সেই চুপ মায়ায়,
করলে দেরি আসতে তুমি
স্বপ্ন আমার ছুঁল ভূমি।
জগত জুড়ে ছাইল ধীরে বিশাল-বিপুল ছায়া
মনের ভিতর রইল আঁকা তোমার নিপুণ কায়া
অন্ধকারে মিলিয়ে গেল রঙধনুটার রঙবাহার
ভাবছি বসে বেলাশেষে কার হলো জিৎ, কার বা হার?
স্বপ্নে আঁকা রঙিন পাখা এবার যাবে থেমে
ভূঁইচাঁপাদের নিটোল চোখে আসবে যে ঘুম নেমে।

## পরিচয়

এই দেখো, করতলে এক ফোঁটা রক্ত
কেমন ক্রোধের মতো উষ্ণ
কান পেতে শোন রক্তবীজ অসুরের গান।
এক নয় সহস্র সহস্র অসুর করতলে নাচে
ঈশ্বরও নির্বাক আজ আপন খেয়ালে;
দুএকজন মানুষ নক্ষত্রসমান বাঁচে আপন যন্ত্রণার বিন্যাসে –
বাকি সব হিন্দু-মুসলিম স্বতন্ত্র স্রোতে,
কী অদ্ভুত সাম্প্রদায়িকতার চাষ বিশ্ব জুড়ে!

পাখিদের ডেকে ডেকে জানতে চেয়েছি কত
সুচতুর কৌশলে ওরা এড়িয়ে গেছে তারা হিন্দু না মুসলিম
জানতে চেয়েছি, কোন দেশে বাড়ি তার কী বা ঠিকানা
সুমিষ্ট গান গেয়ে চলে গেছে অন্যখানে
নামাজ কিংবা প্রার্থনা করে কি বা না করে
উত্তর অজানা
জানি শুধু মানুষেরই আছে ভেদাভেদ,
মানুষেরই বড় প্রয়োজন বেশি করে অমানুষ সাজার।

করতলে এক ফোঁটা রক্ত রক্তবীজ অসুরের গান গায়।
বুঝে গেছি মানুষ মানুষ নয়, বিভিন্ন সম্প্রদায়
এটাই মানুষের শেষ পরিচয়।

## ওমা থেকে

ক্রো-ম্যাগনন মানুষ হাঁটি অনন্তের পথে
পদচিহ্ন আমার পৃথিবীর বুকে চলমান আলপনা
ওমা নদীর তীর বেয়ে শিশু-মানব অজানা আগামীর সন্ধানে
লক্ষ লক্ষ বছর রৌদ্র-ঝড়ে ক্ষীয়মাণ
নদীজলঢেউ লালন করেছে স্বপ্ন
একটি অচঞ্চল মুহূর্ত দূরবর্তী প্রতীক্ষার দাবী,
সভ্যতা মুছে দিয়েছে পদচিহ্ন আমার রথের চাকায়।

আমাদের শস্যকণায় সঞ্চিত সন্তানের কান্না
বোবা ডাহুক ডেকে আনে সুদূর অতীত
ঘোলাজলে ডুবে যাবে বৃহত্তম ব-দ্বীপ, রাজনীতি কফিনবন্দি
অনন্তনাগের ফণায় একলা পৃথিবী
নদীগুলো নিশ্চিহ্ন হলে ছোট্ট ছোট্ট পা ফেলে
কোথায় হাঁটবে ওমা তীরের শিশু?

তবুও কারখানায় স্বপ্ন তৈরির হিড়িক
নদীগুলো নর্দমা কিংবা পয়োনিষ্কাশনের খাল
নগরগুলো সুদৃশ্য ডাস্টবিন উপচেপড়া মানুষের;

নিজেই নিজকে মৃত পশু সাজালে কী আর করার থাকে নদীর?

## ছেলেবেলা

ছেলেবেলায় ভাবনা ছিল – বাবার মতো বড় হব কবে
চারপাশে ঢের লোকজনেরা ঘিরে ঘিরে রবে
থালায় থালায় মিষ্টিরাশি, সামনে চেয়ার সারি
সেলামে সেলামে ঝরে পুষ্পশর যে তারি।

এখন ভাবি আবার যদি শিশুটি হই ফিরে
মায়ের বুকে পরম সুখে রইব আদর ঘিরে।

এতদিনে জেনে গেছি বুঝতে পারি আমি
মিষ্টিদানায় কৃত্রিমতা সেলামে ভণ্ডামি
হাসিমাখা ঠোঁটে বাজে ফরমালিনের বাঁশি
চাটুকারে ভরা স্বদেশ অনল রাশি রাশি
মাথার উপর বসছে চেপে সিসিফাসের পাথর
পায়ের নিচে মাটির আকাল হচ্ছি বৃথাই কাতর
ডুবতে থাকি নিজে নিজেই একার ভেতর একা
খুঁজে ফিরি কিশোরবেলার হারানো সব রেখা।

# ভূমিকাবদল

এখন আমি বৃদ্ধের ভূমিকায়
গোঁফ-দাড়ি-চুল সাদা, শুভ্র তুষার
নাকে হাই পাওয়ারের চশমা, ফোকলা দাঁত
চোখে হলুদরঙা স্মৃতি
মরচেধরা অতীতের যোগ-বিয়োগ –

ছেলেবেলার মঞ্চে গানের বালক
কণ্ঠ চিরে চিরে লাল-নীল যন্ত্রণার বিলাপ,
অন্ধ মায়ের হাত ধরে ভিক্ষাচর্চা কিংবা জুতো পালিশ
প্রাপ্তি অবজ্ঞা আর বাবুদের ছুঁড়ে মারা সিকি কিংবা আধুলি।

কৈশোরে এ নাটকেই অভিমন্যু
মেরুদণ্ড সোজা, বুকে যোদ্ধার সাহস
ধমনী টান টান ধনুকের ছিলা,
তখন আমার ঠাকুরদা ছিলেন বৃদ্ধের ভূমিকায়
তাঁর যাবতীয় সবকিছু নিয়ে অতিশয় ঠাট্টা।

যৌবনে অর্জুন নিপুণ তীরন্দাজ গাণ্ডীব হাতে
স্থির নিশানা মৎস্যচক্ষু ভেদে
পুরস্কার করতালি বৃষ্টিধারার মতো।

সেই আমি শেষ দৃশ্যে বড় করুণ
নদী আছে জল নেই এমনি দাপট
নাট্যচক্রের অভিনেতা এমনই সবাই
কুঁড়ি থেকে ফুল, তারপর ঝরে যাওয়া
শাখায় নতুন কুঁড়ি আবার প্রভাত বেলায়।
বারবার ভূমিকাবদল মঞ্চের মৃত আলোয় –

শেষ দৃশ্যে কালো পর্দার আড়ালে শরশয্যায় ভীষ্ম
ক্ল্যারিওনেটের সুরে ক্লিষ্ট যবনিকা।

## নদী

আমার বাড়ির পাশে কোন নদী নেই, ছিল না কোনকালে
তাই আমার তেমন কোন জুতসই শৈশবস্মৃতি নেই
স্থির চিত্রের মতো টুক্‌রো টুক্‌রো কিছু স্মৃতি ধূসর বিবর্ণ
তাতে স্রোতের বেগ নেই, আবেগ নেই।
এপার ওপার হয় নি বেহুলার ভাসান ভাসান খেলা
কিংবা স্রোতের মুখে কেউটের সাথে দূরের পাল্লা
নেই মাছ ধরার সঞ্চয় কিংবা ডুবসাঁতারের মাতম।

মেঠোপথের সাথে মিতালি ছিল ঠিক শিরা-উপশিরার মতো ছড়ানো
ছিল সবুজের ঢেউয়ে নাক উঁচিয়ে হেঁটে চলা বৈকুণ্ঠপুরের পথে
নির্জন পুকুরের বাঁশঝাড়ে, হিজল বনে ছিল জমে থাকা ভয়
ঘোলাজলের ঘূর্ণি ছিল না পায়ে পায়ে
ভাঙনের ভয় না হলে কি রোমান্স থাকে বুকে?

আমার বাড়ির পাশে কোন নদী নেই, তাই ছেলেবেলাও নেই,
কারো বাড়ির পাশেই কি আর নদী আছে?

## কাঁদতে পারি

এই দেখো আজ আমি তোমাদের মতো কাঁদতে পারি
কাঁদতে পারি ঘনঘোর বর্ষার মতো উঠোন জুড়ে
অবিরাম ঝর্ণার মতো ছলছল নুড়ির বুকে;
এতদিন মেঘেদের বারণ ছিল হয়তবা অযথা বিচরণ
বৃষ্টিফোঁটায় জমে ছিল করুণ আগুন
আজ আর কোন পরিপত্র নেই পৃথিবীর কান্নার বিপরীতে
বুকের কানাচে চেরাপুঞ্জি ফিরে আসে সহস্র নিনাদে।

শৈশবে কান্না ছিল সহচরীর মতো টুপটাপ চোখের সীমান্তে
খড়কুটোর বাসা কোটরে কালকেউটের বাস
ছোবলে ছোবলে নীল কষ্ট প্রশাখা মেলে
বিস্ময় হজম করে আমিও মানুষ হয়ে শুয়ে পড়ি মাটিতে
দুবেলা কষ্ট গিলি বিষজ্বালা বুকে
ঘুমের ভিতর ভিজে ওঠে বালিশ আপন সত্তা
সহস্র বাহু মেলে অন্ধকার আলিঙ্গন করে মিশে যাই
বাতাসে থেকে যায় কান্নার ঘ্রাণ।
আজ আমি প্রাণ খুলে কাঁদতে পারি আকাশের মতো অবিরল।

## ইন্দিরা

পিছন থেকে দুহাতে চোখ ঢেকে বলেছিলে –
'মৃত্যুঞ্জয়, বল্ দেখি কে আমি?'
অমন করে অচেনা কেউ আর কখনও আমার চোখ ঢেকে দেয় নি
অমন করে মিহি গলায় আর কখনও কেউ 'মৃত্যুঞ্জয়' বলে ডাকে নি,
তোমার মাখন স্পর্শ তরল হৃদয়ে ঝড় ডেকেছিল
শ্বাস যেন তালবনে করতালি
বলেছিলাম – আমি মৃত্যুঞ্জয় নই।
বিশ্বাস কর নি আমার কথা বিদ্যুৎ চলে গেলে
চোখ থেকে হাত সরালেও রয়ে গেল অন্ধকার
আমি তাই মৃত্যুঞ্জয়ই থেকে যাই করতলে তোমার –
তুমি যেন অন্ধকারে প্রথম দেখা বনলতা সেন।

ঘরের কোণে একটা তানপুরা ছিল চুপচাপ,
বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে কোন এক নির্জন সায়াহ্নে
আমার ঠোঁটে মিহি রঙের গেলাস তুলে দিয়েছিলে, মনে আছে?
তুমি বোঝ নি, তোমার বুকে চুম্বক ছিল?
আমি ছোট্ট এক টুক্‌রো লোহা?
অথচ কী দৃঢ়তায় মৌন আমি তানপুরাটার মতো বেজে ওঠার অপেক্ষায়।

আজন্মের শীত জমে ছিল তানপুরাটার তারে
অশ্রুত শ্রুতির ভিতর কিছু কম্পন অচঞ্চল ছিল নির্জন বৈকালে,
মনে আছে, তোমার আঙুলগুলো সাতরঙ খুঁজেছিল চোখের জলে।

ইতিহাসের কোথাও লেখা নেই সে সায়াহ্নের ভুল
থাক সে জমে নৈঃশব্দ-সংগীত তানপুরাটার তারে।

## তানপুরা

কে বেশি বেজেছিল, তানপুরাটা নাকি বাদনরত মেয়ে
প্রশ্নটা অমিমাংসিত যেহেতু হৃদয়ে জোয়ারি ছিল দুজনের
বসার ভঙ্গিও এক স্থির সুরযন্ত্র
আমার দুচোখে দুই তানপুরা মঞ্চের রঙিন আলোয়
কে বেশি বেজেছিল স্বপ্নপ্রান্তরে ধ্রুপদসন্ধ্যায়
প্রশ্নটা অবান্তর একই সুরে বাঁধা কোন মোহন আলোয়।

মেয়েটিকে তানপুরার মতো লাগছিল, তানপুরাকে মেয়ে
হোমাগ্নির ভেতর যেন স্বপ্নের যুগলবন্দি
পাশে সুরকে জড়ানো রজনীগন্ধার সুবাসিত শ্বাস
তানপুরার মতো মেয়েটি যেন ভাস্কর্য রাগিণীর।

কার বেশি কষ্ট ছিল আঁচলে জড়ানো
কার বুকে বেজেছিল কাঁটার আঘাত
কাল গুণে চিনে নেয় বেহাগের প্রমত্ত বিলাপ
এই আকালেও কারো মন পোড়ে আনাচে কানাচ
দুজন যেনবা এক তানপুরার ষড়জ-পঞ্চম।

কে বেশি বেজেছিল হৃদয়ের সপ্তক জুড়ে
প্রশ্নটা প্রশ্নই থাক ছায়াপখি হয়ে আকালের প্রান্তরে।

# নিশীথ

নিশীথ, কী আশ্চর্য ভালোবাসা বুনে রেখেছি তোমার জন্যে
সফল কৃষকের মতো বুকের ভেতরে,
তোমার অন্ধকার আমাকে আলোর কারাকক্ষ থেকে মুক্তি দেয় সহজেই
নিজেকে লুকিয়ে রাখতে জীবনের চৌহদ্দি থেকে।
আকাশে জোনাকির মতো জ্বলে থাকা নক্ষত্র
আর মাটিতে নক্ষত্রের মতো জ্বলে থাকা জোনাকি
দেখে দেখে আমিও জোনাকি হয়ে যাই।
মৃত্যুর পরে ঋষিদের মতো আমিও যেন তোমার নক্ষত্র হই।
পরম বন্ধু আমার, নিশীথ, তুমি ছুঁয়ে দিলে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে যাই –
যেন মায়ের কোলে শিশু; রুপোর কাঠির পরশ তোমার অন্ধকারের ভাঁজে,
আমাকে নিঃশব্দ ঘুমপাড়ানি গান শোনায়।

করোটির ভেতর, মানুষের হাড়ের ভেতর কী গোপন চাষাবাদ রাতদিন
কণা কণা মৃত্যু জমে জীবনের বেলাভূমিতে প্রতি সায়াহ্নে,
মগজে সামুদ্রিক কাঁকড়া কী সব আলপনা আঁকে সুচতুর কৌশলে;
এক বৃহৎ রাত্রির বুকে আমরা কণা কণা আলো জেগে রই নিভে যাবার দুরন্ত বাসনায়
তোমাতেই বিলীন হবার আশ্চর্য আসক্তি অনুভবে, উপলব্ধিতে
তন্দ্রাহত আত্মাভিমানে
নিশীথ, এসো, মৃদু আলিঙ্গনে সংস্কৃত দ্রবণ করে দাও অগ্নি আর জল
আমার আত্মার ভেতর জমে থাকা অশ্রু
ফোঁটা ফোঁটা জীবনের মতো ঝরুক দারুণ সুখে অবিরাম অনন্তকাল।

## টবের গাছ

বাড়িওয়ালা শান্তি কমিটির নেতা বলে গেল –
আপনার ফুলগাছগুলো খুব বেয়াড়া
ডাগর ডাগর তরুণীর মতো ডগমগ বারান্দায় উঁকিঝুকি মারে
বেশরম গা এলিয়ে পড়ে থাকে কার্নিশে, ছাদের সিঁড়িতে
যথাশীঘ্র সামলান, নয়ত বাড়ি ছাড়েন।

স্ত্রীকে ডেকে বললাম – তারায় গান কর না, হারমোনিয়াম বাদ
নাহলে গলা ধাক্কা দিয়েই বের করে দেবে হয়ত
এ প্রদেশে সংগীত নিষিদ্ধ কয়েকশো বছর।

ফুলগাছগুলোর দোষ – ওরা সুন্দর সুন্দর ফুল ফোটায়
আর কেবলই একটু আলোর আশায় গ্রিলের ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকায়
যেখানে বাতাস আর সূর্যকিরণ খেলা করে ভোরে,
অহেতুক যখন তখন প্রজাপতির ভিড় বাড়ায়।

বারান্দায় গিয়ে চুপিচুপি বলি, ফুলবউ, সময়টা ভালো নয়।
যত বলি নিজেকে সামলে রাখ্, কথা শোনে না।
অবশেষে বাড়িই বদল করতে হবে আমাকে,
ওরা কি চায় আমি খোলা মাঠে সংসার পাতি?

সবুজ পাতারা বোঝে না সমস্যা আমার
ভোরের আলোয় চিকচিক হেসে ওঠে আর মৃদু মৃদু দোলে
পাতায় পাতায় বেজে ওঠে আলোর গান পৃথিবীর সুখ
আনন্দ উপচে পড়ে আকাশে।

ওরা জানে না – সবুজও শত্রু হয় কারো কারো
আলো সহ্য হয় না পিঁচুটিপড়া চোখে,
শ্বাপদেরা পছন্দ করে নিকষ কালো অন্ধকার।

## মধুকবি

এই দেখো, তোমার শৈশব ছুঁয়ে বলছি
বাংলা ছেড়ে কোথাও যাব না কখনও,
পোড়া ধূপের মতো নিজকে দহন করে
কী এক উষ্ণতা ছড়িয়ে গেছ চৈতন্য জুড়ে
আমি উষ্ণতা ছড়াব বাংলায় বাংলায় –
আজ এই কপোতাক্ষের করুণ জল ছুঁয়ে আমি স্পন্দিত হই
সঞ্জীবিত হই মাতৃদুগ্ধধারায় নিরন্তর।

দুএক টুকরো সান্ত্বনা ছাড়া আর কোন মেঘ ছিল না রৌদ্রদগ্ধ মাঠে মাঠে
স্মৃতির চাদর গায়ে জড়িয়ে মেহগিনি গাছের শিকড়ে একা নির্জনতায়
মগ্নতার শ্যামলছায়ায় একটি দুপুর ক্ষুদ্র গুল্ম যেন।
তোমার গাছের একটি পাতা ঝরে আমার মাথায়,
তারপর দুটো, এরপর অজস্র, হাজার হাজার বসন্ত বাতাসে
এমন পত্রবৃষ্টি ঝরে নি কখনও আমার এই স্মৃতির আঙিনায়,
এমনি করে তোমার আশিস ঝরে বাংলায় বাংলায়

তোমার কৈশোর ছেঁকে সাগরদাঁড়ীর এক মুঠো ধুলো তুলে নেই হাতে
উপনিষদের ঋষির মতো মন্দ্রস্বরে বলে ওঠে স্বর্ণরেণু –
'জননী জন্মভূমির্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী'।
শুকনো ডালে আমি যেন নিবিড় স্পন্দন হই
আমিও ধুলো হয়ে পাতায় পাতায় উড়ি
আমি যেন অ আ ক খ উজ্জ্বল এক ঝাঁক বর্ণমালা রঙিন।

গৈরিক বাতাসে রবীন্দ্রনাথ গেয়ে ওঠেন 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে'।

# বৈশাখ

প্রতি বৈশাখে ভাবি –
আমার ঘর ভরে যাবে সোনালি ফসলে
ফিরে পাব সবুজ ঢেউ খেলানো ছেলেবেলার মাঠ
সুতোছেঁড়া ঘুড়ির পেছনে ছুটতে ছুটতে ধানের গন্ধ মেখে অনেক দূর
ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর পেরিয়ে মধ্য পাথারে বুড়ির ভিটা
যেখানে জমে থাকে আজন্মের ভয়।

বৈশাখী মেঘে হঠাৎ ঝুপ করে সন্ধে
ঝড়ে কাঁপত দূরের তালবন মহাসমুদ্রের গর্জন
কিচির মিচির বাবুইয়ের ঝাঁক
একলা একা দিশেহারা নওল কিশোর।

প্রতিবার বৈশাখ রুক্ষ থেকে রুক্ষ আরও
প্রান্তর থেকে সবুজ উধাও
খাঁ খাঁ মাটি ফুঁড়ে শুধু রোদ্দুর কাঁপে
মানুষ ইঁটভাঁটা বানায়, সিমেন্ট কারখানা,
গার্মেন্টস, ফ্যাক্টরি, বড়জোর মৎস্যখামার;
সোনামুগ, তিল কিংবা গমের চাষ
চিনা-কাউনের ক্ষেত এখন নগরায়ণের দখলে
চড়কের মেলার মাঠ এখন জোতদারের মুরগিখামার।

কারো ঘরে নেই আর সোনার ফসল
অদ্ভুত সারেঙ্গি যেন কৃষকের সন্তান সারাদিন বাজে
অর্বাচীন কাকের মতো এই শহরের অন্ধগলিতে খুঁজে ফিরি শান্তির মাঠ
ঢেউ খেলানো সবুজ, ফসলের গান
যেখানে ইট-কাঠের বানানো নিজস্ব কারাগারে নিজেই বন্দি।

## মানুষগুলো

মানুষগুলো বৃক্ষের মতো
রোদে পোড়ে, বৃষ্টিতে ভেজে; শেকড়ে জল না পেয়ে শুকোয়
কোন প্রতিবাদ করে না।
মানুষগুলো বৃক্ষের মতো; কিন্তু সবুজ নয়, বিবর্ণ;
বাজপোড়া করুণ কাহিনী।

সত্তার গভীরে শেকড়ের ভ্রমণ
মূলে তাই মরুর আগ্রাসন
ছায়াদান অপরাধ, অপরাধ ফুল ফোটানো
সুবাসিত মুক্ত বাতাসের নিষিদ্ধ প্রদেশ।

মানুষগুলো বৃক্ষের মতো; পাতায় পাতায় তৃষ্ণা নাচে
শেকড়ে জল নেই – তবু হাহাকার করে না।
ডাল ভাঙ, পাতা ছেঁড়; প্রতিবাদ নেই।
মানুষগুলো বৃক্ষের মতো; লাজ নেই, লজ্জা নেই
ক্রোধ নেই, ক্ষোভ নেই; অপমান বোধ নেই;
ঘৃণা নেই; আজন্ম পুড়তে থাকার জ্বালা নেই;
শোণিতে রক্তজবার স্রোত নেই।

মানুষগুলো যদি সত্যিকার বৃক্ষও হত
বাংলাদেশ একটা সবুজ বনভূমি হয়ে যেত।

## বৃক্ষজন্ম

আমাদেরও শিকড় ছিল একদিন এই মাটিতেই বহুদূরদূর প্রোথিত
গভীর গভীর থেকে তুলে আনতাম জীবনের রস;
আমাদেরও পত্র-পুষ্প ডালপালা ছিল, বুকের পাঁজরে ছিল স্বপ্নমোড়া বাতাস
শান্তি ছিল, ঘুম ছিল; ছিল শস্যদানার গান।
হায় বৃক্ষজন্ম, রৌদ্রে পীড়িত চিরল সবুজ
কাল হয়েছে গত রেলের চাকায় ফেলে আসা দীর্ঘশ্বাসের মতো।

পাখিদের বুকে ছিল স্নিগ্ধ ওম
পাতায় পাতায় প্রজাপতি তিরতির পাখায় স্বপ্ন ছড়াত;
গান থেকে মুছে গেছে প্রেম কর্পূরের মতো,
তৃষ্ণা চেটেই জীবন-নৃত্য বহু আকাঙ্ক্ষায় কুণ্ঠিত স্বপ্নের প্রান্তরে
বৃক্ষদের ঘর নেই, পাতার শিহরণ নেই ডালে;
শেকড় থেকে খসে যায় মাটি ভাঙনে ভাঙনে।

ভাঙে বিশ্বাস, ভালোবাসা, শত শতাব্দের আয়োজন
নীল রঙ মুচকি হাসে ভাঙা দর্পণের চতুর কণায়,
চুরি হয়ে যায় পোড়ামাটির জীবন গিমে জাদুঘরে
মূর্খেরা নিজকে বিজয়ী ভেবে হাসে অষ্টপ্রহর;

শেকড় থেকে খসে যায় মাটি
বৃক্ষজন্ম ব্যর্থ হয় শুকনো স্বকালে।
আমাদেরই ইচ্ছে নাচে জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে
পত্র-পুষ্পহীন শুকনো ডালে।

## মন্দাক্রান্তা

‘মন্দাক্রান্তা ছন্দ ভালো না জানলে মেঘদূত বোঝা যায় না;
তোকে মন্দাক্রান্তা শিখিয়ে দেব’
এ কথা বলে আপনি উত্তরের যাত্রী হলেন,
আর ফিরলেন না।
মেঘদূত হাতে নিয়ে বসে থাকি
চাবি হারানো সিন্দুকর মতো
মেঘদূত আমার কোল জুড়ে পড়ে থাকে
বুঝি না যক্ষের আকুতি –

সাদা পৃষ্ঠার কালো কালো অক্ষরগুলো কখন যেন
দৃষ্টির সীমান্তে আষাঢ়ের তরল মেঘ,
বুকের ভেতর গুরুগুরু জলদগম্ভীর পাথার
আমার চৈতন্য জুড়ে কী দুর্বিষহ অন্ধকারের খেলা
সমস্ত জগত-সংসার রামগিরি বলে মনে হয়
যেখানে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়ে শুধু একাকিত্বের বিলাপ।

নিজেই যক্ষ এক এখানের মেঘেরা কারও দূত হয় না,
মন্দাক্রান্তা ছন্দ ভালো জানা নেই বলেই হয়ত
চির অচেনাই থেকে গেল মেঘদূত –

## ঈশ্বর দেখে যাও

ঈশ্বর, দেখে যাও তুমি
শাহ্‌বাগে উত্তাল জাগছে যারা বিনিদ্র রাত
শাহ্‌বাগে টগবগ ফুটছে যারা থোকায় থোকায় রক্ত অশোক
শাহ্‌বাগে নিয়ত জ্বলছে যারা দ্রোহের বারুদ
এরা বাঙালি, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ তরুণ।

এদের কোন দল নেই – এরা বাঙালি
না হিন্দু, না মুসলিম – বাংলার বিবেক
ধনী কিংবা গরিব নয় – এরা বাঙালি
হৃদয়পুরে জোয়ার জাগা এই সেই স্বাধিকারের মেলা
প্রত্যেক তরুণ একই ফুলের স্পর্ধিত পাপড়ি।

মার্কস দেখে যাও, লেনিন দেখে যাও, দেখে যাও মুজিব
এ তারুণ্য মুক্তি ও সাম্যের, ক্ষিধে পেলে গুলি খেয়ে বাঁচে
বিপ্লব দেখেছে বিশ্ব, দেখে নি বাংলার তারুণ্যজোয়ার
এ এক বিস্ময়, কোথা থেকে এল এত প্রাণের সঞ্চয়
শ্লোগানে সংগীতে নাচে বৃত্তাকার গুচ্ছ গুচ্ছ আগুন
ফণা তোলে উর্ধ্বমুখে – এক দফা এক দাবি – রাজাকারের ফাঁসি।

বাঙালির রক্ত টগবগে দুরন্ত লাভা দিগ্বিদিক ছোটে
মোগল, পাঠান, ইংরেজ, বর্গিও ফিরে গেছে একদিন তাড়া খেয়ে শেষে
বাহান্ন, একাত্তর, নব্বই বিপন্ন মানবতায় – বারেবারে তারুণ্য সোচ্চার
দুঃশাসনের ঠাঁই নেই কোনকালে এই বাংলায়।

যতই বিস্তার করুক হায়েনা নখ-দন্ত থাবা
যতই উঠুক মাটি ফুঁড়ে রক্তবীজ অসুর
বাঙালির করতলে ক্ষমা নেই, নির্মূল একদিন সময়ের দাবি
শাহ্‌বাগে তারুণ্য বেছে নেয় নতুন শপথ।

ঈশ্বর, জেনে যাও – বাংলার তরুণ প্রতিদ্বন্দ্বী তোমার।

## জাগ্রত শাহ্‌বাগ জাগ্রত বিবেক

এল বসন্ত প্রাণে প্রাণে প্রাণের ছোঁয়া, প্রণয় পরিণত প্রতিবাদের ঝড়ে
বসন্তের প্রেম জ্বলে দ্রোহের আগুনে
জাগ্রত শাহ্‌বাগ, জাগ্রত বিবেক, মানবতার প্লাবন কার সাধ্য রোখে?
প্রজন্ম চত্বরে আজ বাঁধভাঙা ঢেউ, পিশাচের অন্তর কাঁপে।
ওরা গায় গান অগ্নিমুখো সুরের ফলা
ওরা নাচে পদভারে বিশ্ব দোলে
সাবাস শাহ্‌বাগ, সাবাস তরুণ
'এ বিশ্ব অবাক তাকিয়ে রয়'।

কী বিস্ময় উত্তাল তারুণ্যে
ওরা জ্বালে সারি সারি লেলিহান মশাল
ওরা ব্যূহরূপ বৃত্ত বানায় এখানে ওখানে
কী এক আশ্চর্য মোহে জীবন জেগেছে কাতারে কাতার
অন্ধকার পালায় কেমন দেখো শেয়ালের মতো

ফাঁসির দড়ি ক্ষয়ে যাবে আন্দোলন নয়
এ অগ্নি উপত্যকা জল্লাদের মৃত্যুকূপ
এখানে স্থান নেই বেহায়া পিশাচের।

জেগেছে হিন্দু, জেগেছে মুসলিম, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান
জামাত শিবির রাজাকার – মুসলিম নয়, বাংলার দুশমন
শান্তি কথার অর্থ জানে না ভণ্ড নরপিশাচ
ধর্ম মানে না ধর্মের গায় জয়,
হায়েনাগুলোর কম্পিত হাতে তজবি দ্রুত হয়।

সাবাস শাহ্‌বাগ, সাবাস তরুণ, টলে শয়তানের ভিত।

কী কাণ্ডই না দেখাল ওরা শাহ্‌বাগের এই প্রজন্ম চত্বরে
বুঝেছি এবার, এদেরই বলে নয়া বাংলার দামাল ছেলে?

## ক্যাসাবিয়াঙ্কা

'টিল ডেথ, আমরা নড়ব না' বলল সাহসী তরুণ
'চাই শত্রুমুক্ত স্বদেশ, রাজাকারের ফাঁসি'
ফুলের মতো নিষ্পাপ ছোট্ট মেয়েটি বলল
'রাজপথ ছাড়ব না, যতক্ষণ না আদায় দাবি'
জাতীয় পতাকায় মোড়া রাজীবের কফিন ছুঁয়ে ক্ষুব্ধ যুবক
'একটাও রাজাকার ছাড়ব না, ফাঁসি দেব রাজপথে প্রকাশ্য আলোয়'
বৃষ্টিও কেঁপে ওঠে শ্লোগানে শ্লোগানে মেঘে মেঘে বাজ
কত বেশি ঘৃণা হলে নিঃশেষ হয় না, বেঁচে থাকে চল্লিশ বছর।

কণ্ঠ চিরে যার আগুন বেরোয় সোনামেয়ে
ক্লান্তি নেই, শব্দযন্ত্র হার মানে, নাম তার লাকি আক্তার
'জয় বাংলা' সরব মুখরিত প্রজন্ম চত্বর
আটলান্টিক পেরিয়ে ভিয়েনা মেলবোর্ন সুইডেন
পৌঁছে যায় তারুণ্যের হুঙ্কার, বিশ্ব তোলে প্রতিধ্বনি
প্রাণভরে মানবতার সংহতি জানায়।

আকাশ জুড়ে একযোগে লাল-সবুজের উচ্চারণ
সারা বাংলায় কচি কচি কণ্ঠে দৃপ্ত শপথ
'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'
বুকে সবার একই সত্য উদ্বেলিত সবাই বাঙালি
শ্বাপদমুক্ত বাংলা নয়ত আমৃত্যু রাজপথ দখল।

রাজপথ নড়ে যাবে, আগুনের গোলায় উড়ে যাবে মহান শহর
ক্যাসাবিয়াঙ্কা ওরা, অনড়।

## হরতালনামা

কাল আবার হরতাল ডেকেছে বিরোধী দল
কাল আবার জীবন মুঠোয় করে পথে বেরুবে মানুষ
রক্ত আর আগুনের উল্লাস দিনভর পথে পথে,
অবশ্য বিরোধী দলই হরতাল ডাকে সবসময়
বিরোধী দল হলে হরতাল ডাকতে হয়, শাস্ত্রমতে বিধেয়,
লাভ-ক্ষতির বিষয় নয় হরতাল ডাকার মধ্যে বীরত্ব আছে,
স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

যারা কবিতা পড়ে না কাব্যচর্চা পণ্ডশ্রম তাদের জন্য
আপ্তবাক্য সব পকেটে কাগজবন্দি
যারা আগুন লাগায় জলের গল্প পড়ে না তারা,
গাড়ি পোড়ে, মানুষ পোড়ে, পোড়ে পোড়া হৃদয়
চারপাশ পোড়ে তাই অবলীলায় হরতাল হলেই।
ভাংচুরের মধ্যে অতৃপ্ত উত্তেজনা আছে এক ধরনের, সূক্ষ্ম
বোবা যানবাহনের গায়ে আঘাত সাহসের পরিচায়ক
টায়ারে আগুন জ্বেলে লাঠিপেটা দুদ্দাড় আভিজাত্যের ভূত।

হরতাল হলে রাস্তাগুলো ক্রিকেটের পিচ হয়ে যায় আজব শহরে
ছেলেরা খেলার সুযোগ পায় একবেলা
বুড়োরা হাওয়া খেতে বেরয় নৈমিত্তিক গণ্ডি ছেড়ে,
রোদচোখে রাস্তায় সবাইকে প্রিকেটার মনে হয়
বাসগুলো সন্ত্রস্ত দৌড়য় উর্ধ্বশ্বাসে
মানুষ দেখলে মানুষ ভয় পায় হরতালের উদ্ভট তালে।

রাজপথ পুড়ে যাক, পুড়ুক সময়, জয় হোক হরতালের
তালহারা জীবনের কানাগলিতে হরতালের কোন জুড়ি নেই।

## শীত

ঘুমভাঙা চোখে তাকাতেই দরজায় তুমি
ভিখিরির মতো দাঁড়িয়ে গায়ে খদ্দরের চাদর
পুরনো স্মৃতির মতো কিছু ভাবনা ছিল ঠোঁটে গচ্ছিত,
খুব কি শীত পড়েছিল সেদিন আমাদের উঠোনে?

কুয়াশার রেণু গায়ে মেখে এক ঝলক বাতাস তোমার গাল ছুঁয়ে গেল
তারপর আমার কানে কানে বলে গেল বিকেলের গান হবে বারান্দায়
বিকেল গড়িয়ে সন্ধে তারপর রাত কখন যেন সব তারা নিভে গেছে
একটি তারা যেন আমার দুয়ারে ঝুলে আছে ম্লান ঘুমচোখে
যেখানে তুমি দাঁড়িয়েছিলে শতাব্দীর মতো একা
ঘাসের ডগায় জমে ছিল কিছু কান্না কিছু ভুল কিছু বেহাগী আলাপ –
ঘুম ভাঙতেই কুয়াশার মূর্তি চুরমার।

তারপর ঘুম ভাঙলেই এখনও প্রতি ভোরে দরজায় তাকাই
এখন আর তেমন শীত পড়ে না বোধ হয় কীর্তনখোলায়
দরজায় চাদরে জড়ানো তোমার কোন ছায়া নেই,
ছায়ারা এমন করেই মিলিয়ে যায় অগণন নক্ষত্রের ভিড়ে।
ছায়ারও আকাল পড়ে ঘুমভাঙা দরজার ভুলে –

## মায়াজলে কালরাত

পেছনে কোলাহল অনন্ত
ময়লার শহর গ্রামাঞ্চল অস্থিরচিত্ত মানুষের ঢল
পথে পথে জীবনের যাবতীয় জঞ্জাল
সামনে সুদৃঢ় অন্ধকার
সমুদ্রগর্জন তরঙ্গশীর্ষে ফসফরাসের আলো
মিটিমিটি তারা শূন্যতা বিলাসে অজানা বাতিঘর
দাঁড়ায়ে একা সৈকতহীন তীরে
হৃদয়ে লোনাজলের ছোবল নৈঃশব্দে প্রকট
বহুযুগ আগের কোন শব যেন
অনুভূতিহীন শীতলতার চাদরে মোড়া;
এই কি জীবনের মানে যেখানে এসে
পাড় ভাঙে বিশ্বাসের বেলাভূমি ঝপ্‌ঝপ্‌ সমুদ্রজলে
কান্নাগুলো কখন যেন মায়াজলে মিশে যায় অদৃশ্য সংকেতে
তবুও মানুষ আঁকড়ে ধরে বালুমুষ্ঠি মূর্খের তেজে
মানবজন্ম শ্রেষ্ঠ প্রমাণের দারুণ কৌশলে
পদতলে মাটি নেই তবু শেকড়ের বিশ্বাস প্রশাখা মেলে নিরন্তর –

মহাকাল লুফে নেয় করতলে মানুষের স্পর্ধা
গণ্ডূষে পান করে কান্না হাসির চোলাই
জীবন, টুক্‌রো টুক্‌রো ভুল মাখানো হাওয়াই মিঠাই
বেঁচে থাকা খতিয়ানহীন অদ্ভুত কোন নিয়তির খেয়াল।